প্রেমের রং

ময়ূরকণ্ঠী

অমিয়া চক্রবর্তী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই
১৩৬৭

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা
এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট
বোম্বাই-১

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৬

যাঁর উদার স্নেহময় মহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার জীবন সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়েছে তাঁরই উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম।

॥ এক ॥

১৯৬০ সালে লণ্ডনের টেট্ গ্যালারিতে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত শিল্পী পিকাসোর ছবির এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল। হাজার হাজার দর্শকের অন্যতম ছিল পিটার রে, আর্ট কলেজের একটি তরুণ ছাত্র।

ছবি দেখার পবে সে যখন বাইরে বেরিয়ে এল, অকটোবরের ক্ষণস্থায়ী এক ছুর্লভ রঙীন গোধূলি তখন রক্তিম আলোয় চারদিক প্লাবিত করেছিল। সামনে আবীর-বাঙা টেম্‌স্ নদী, স্বপ্নাচ্ছন্নের মত পিটার তার তীরে এসে দাঁড়াল। বাস্তববোধ হয়তো তার মন থেকে তখন একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, না হলে সে দেখতে পেতো নিজের অজানতে সে একটি তরুণীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন কি তার গায়ের সঙ্গে ওব গায়ের ছোঁয়াও লাগছে। মেয়েটি একটু সরে দাঁড়াতে পিটার সচেতন হয়ে ওর দিকে চোখ ফেরালো; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো সে। অচেনা ভারতীয় মেয়েটি না জানি তাকে কত বড় অভদ্র ভেবেছে মনে করে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সে কুণ্ঠার সঙ্গে বললো— আমি আপনাকে দেখতে পাইনি সেজন্যে খুব ছুঃখিত, আশা করি আমাকে মাপ করবেন।

মেয়েটি ওর দিকে চাইলো, নিঃশব্দ হাসিতে জানালো যে, সে এতে কিছু মনে করেনি।

পিটার এবার সাহস পেয়ে বলে—যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, কিন্তু ভয় পাচ্ছি আমি আমার অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছি না তো?

মেয়েটি আর একবার চোখ তুললো, স্মিত মুখে বললো—কি বলতে চান বলুন।

একটুখানি ইতস্ততঃ করে পিটার বলে—আমার চোখ যদি ভুল না করে থাকে তবে আমার মনে হয় কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাকে প্রদর্শনীর ভেতরে দেখেছি, খুব মন দিয়ে ছবি দেখছিলেন।

মেয়েটি এবার হাসিমুখে বললো—আপনার চোখ আপনাকে মোটেই প্রতারণা করেনি কিন্তু অত লোকের ভিড়ে প্রদর্শনীর মধ্যে দেখে কি করে বাইরে এসে চিনলেন? বড় আশ্চর্য তো!

ছেলেটি একটু হাসলো। বললো—আপনাদের ভারতীয় শাড়ীর বৈচিত্র্যই ভিড়ের মধ্যেও আমাদের চোখে আপনাদের বিশিষ্ট করে তোলে, আর মনে হয়—ওখানে নীল রংয়ের শাড়ী-পরা ভারতীয় মেয়ে একমাত্র আপনিই ছিলেন।

মেয়েটি চুপ করে রইলো। পিটারের আড়ষ্ট ভাবটা একটু কেটে গেছে, সাগ্রহে বললো—যদি ত্রুটি না নেন, তবে জিজ্ঞাসা করবো, আপনার বোধহয় ছবিতে খুব অনুবাগ আছে? আচ্ছা, আপনি নিজে কি আঁকেন?

হাসিমুখে মেয়েটি উত্তর দেয়—আমার কাছে আপনার প্রত্যাশা একটু বেশী মনে হয় কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আপনাকে নিরাশ করতে হল। ছবি আমি দেখতে খুব ভালবাসি যদিও ভালো বুঝতে পারিনে, কিন্তু আঁকতে আমি জানিনে। আপনি ছবি আঁকেন মনে হচ্ছে।

এবার অকৃপণ হাসিতে ছেলেটির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে—একটু একটু আঁকি বইকি, এই কিছুদিন আগে আমার ছবির একটা ক্ষুদ্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। শিল্পী পিকাসোর ছবির অনুরাগী আমি।

—শুনে ভারি ভালো লাগলো। যাঁরা কোনো আর্টের চর্চা করেন তাঁদের ওপর আমার শ্রদ্ধা হয়। তার কারণ আমি নিজে ওদিকে একেবারে নিরেট কিনা, কোনো গুণই আমার মধ্যে নেই।

পিটার মেয়েটির কথা শুনে পুলকিত হয়, বলে—তাই নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বসূচক আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু মেয়েটি তার সঙ্গে করমর্দন না করে ওর হাতখানা একটু স্পর্শ করে মাত্র। অপ্রতিভ হয়ে পিটার ভাবলো ভারতীয় মেয়েরা বোধহয় অপরিচিতের সঙ্গে করমর্দন করাটা বিশেষ পছন্দ করে না। মনে মনে ঠিক করলো—এরপর সে ভারতীয় প্রথায় সম্ভাষণ জানাবে। বিদায়ের সময় দুই হাত তুলে পিটার হাসি মুখে মেয়েটিকে নমস্কার করলো, এ-পদ্ধতিটি তার একজন ভারতীয় বন্ধুর কাছে শেখা। মেয়েটিও তাকে প্রতি-নমস্কার জানালো।

এর কয়েকদিন পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আবার একদিন পিটারের সঙ্গে সুরঙ্গমার দেখা। ছবির গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এসে পিটার যখন রীডিং রুমে টেবিলের সামনে বসলো, মনে হয় সুরঙ্গমাকে সে মোটেই দেখতে পায়নি। সামনে খাতা আর পেনসিল নিয়ে পিটার ছবি আঁকছে ধ্যানমগ্নের মত, কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই। ছবির ওপর নত হয়ে আছে তার দীর্ঘপক্ষ্ম নীল দুটি চোখ, সোনালী চুলের গুচ্ছ কপালের ওপরে নেমে এসেছে। সুদর্শন ছেলেটির এই একাগ্র তন্ময়তা সুরঙ্গমার ভারি ভালো লাগলো। অনেকক্ষণ পরে পিটার চোখ তুলতেই সুরঙ্গমার স্নিগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে ওর দৃষ্টি মিলিত হল। তখন ও উঠে এসে হাসিমুখে শুভসন্ধ্যা জানালো। সুরঙ্গমাও শিষ্টাচার বিনিময় করে বললো—আপনি দেখছি চেনা মানুষকেও কখনো কখনো চিনতে পারেন না!

পিটার মোটেই অপ্রতিভ হল না, আস্তে আস্তে বললো—খুব বেশী করেই চিনতে পারি, চেনা লোকটির মনের রূপটা অবধি দেখতে পাই কিন্তু তখন তার বাইরের চেহারাটা আর আমার চোখে পড়ে না।

সকৌতুকে সুরঙ্গমা বলে—সে আবার কি রকম অবস্থা বলুন তো?

পিটার তার হাতের পেনসিল স্কেচখানা ধীরে ধীরে সুরঙ্গমার

চোখের সামনে তুলে ধরে, প্রশ্ন করে—এ ছবিখানা দেখে কিছু বুঝতে পারছেন ?

সুরঙ্গমা বলে—কোন ছবির নিহিত ভাবটাকে এত সহজে ধরে ফেলার সাধ্য আমার নেই, বিশেষ করে আপনার আঁকা। বুঝিয়ে দিলে হয়তো বুঝতে পারবো।

পিটার আহত হয়। বলে—আমার আঁকা কি এতই দুর্বোধ্য ? এতই খারাপ ?

ছেলেটি এত সরল! সহজ কথায় দুঃখ পায়, ঠাট্টাকে ধরতে পারে না। ওর ওপরে সহানুভূতি জাগে সুরঙ্গমার। সান্ত্বনার স্বরে বলে—না, না, তাই কি বলছি ? দুর্বোধ্য মানেই কি খারাপ ? আপনার আঁকা, মানে আপনি পিকাসোর অনুবর্তী কিনা আমার তো এ-পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় নেই।

আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে পিটার বলে ওঠে—আমি ভেবেছিলাম টম-ডিক্-হ্যারির সঙ্গে আপনি আলাদা, আমার সব বন্ধুবা ছবির এতটুকুও মর্ম গ্রহণ করতে পারে না। আপনি জানেন না, ডরোথির এই ধরনের কথায় আমি কত দুঃখ পাই, শুধু পামেলাই কিছু কিছু রস গ্রহণ করতে পারে, আপনার কাছেও আমি সেই আশাই করেছিলাম।

সুরঙ্গমা হেসে ওঠে। বলে—দুর্ভাগ্যবশতঃ টম-ডিক্-হ্যারির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, ডরোথির সঙ্গেও নয়, তবে পামেলা নামের একটি মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ে, ছবির সম্বন্ধে তার অনুরাগ আছে জানি। সে আমার বন্ধু, মেয়েটি সত্যিকার কলারসিক, ওর পুরো নাম পামেলা ব্রাউন।

সুরঙ্গমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে পিটারের ক্ষোভ যায় মিলিয়ে, সেও হাসে। আস্তে আস্তে বলে—আমার মনে হয় আপনি ইচ্ছে করলেই কোন ছবির নিহিত অর্থকে ধরতে পারেন, শুধু ইচ্ছে করেন না। এ ছবিখানা কোন একটি মেয়ের, সে মেয়ে আপনি।

সুরঙ্গমা একটু চম্‌কে ওঠে। তারপর বলে—কিন্তু আমার ছবি আঁকার কথা আমায় তো জানাননি কিছু ?

পিটার অসঙ্কোচে উত্তর দেয়—জানাবার সময় ছিল না। আপনি যখন একখানা বই হাতে নিয়ে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন তখন আপনার সে-চোখ দেখে মনে হয়েছিল আপনি যেন কোন্ সুদূরে চলে গেছেন, এ পৃথিবীর ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নেই। সেই মুহূর্তটিকে পাছে হারাই তাই তাড়াতাড়ি স্কেচ করে নিয়েছি। তা ছাড়া, কেউ যদি একটি ফুলের স্বপ্নকে রূপ দিতে চায় সেকি ফুলের অনুমতির অপেক্ষা করে ?

হাসিমুখে সুরঙ্গমা বলে—আপনি দেখছি একজন শুধু খাঁটি চিত্র-শিল্পী নন্, কথার শিল্পীও বটে !

পিটার অল্প অল্প হাসে, তার নীল চোখে যেন আলো জ্বলে।

এদের দুজনেরই রীডিং রুমের বিশেষ কার্ড সংগ্রহ করা ছিল, দুজনে এক কোণে গিয়ে বসে। তারপর অনেক কথা, সুরঙ্গমা ছবি আঁকার কি রকম পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়, মোনে, মানে প্রভৃতি শিল্পীর অঙ্কনপ্রণালীর সঙ্গে পিকাসোর অঙ্কনরীতির মূলগত পার্থক্য কি, ইম্প্রেসানিজম্ বা কিউবিজম্ সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামত কি ইত্যাদি—।

সুরঙ্গমা উত্তর দেয়—দেখুন আমি চিত্রকলা সম্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞ নই, এসব বিষয় নিয়ে কখনও চিন্তাও করিনি। দেখতে ভালো লাগে, ভাবগ্রহণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, চিত্রশিল্পীদের নামগুলো জানা আছে এই পর্যন্তই। আপনি এর অনুশীলন করছেন, আপনার জ্ঞান অনেক গভীরে পৌঁছেছে, আমার জ্ঞান তো ভাসা-ভাসা, আপনার সমকক্ষ হয়ে আলোচনা করবার ক্ষমতা আমার নেই।

পিটার তার বড় বড় পক্ষ্মযুক্ত নীল চোখ দুটি নামিয়ে সলজ্জভাবে বলে—আমি আবেগের বশে আপনার ওপর বেশী চাপ দিচ্ছি, ছবির আলোচনায় আমার বোধ থাকে না, কোথায় থামতে হবে। মাপ

করবেন, আপনাকে হয়তো বিরক্ত করেছি, আপনার সঙ্গে তো মোটে ছদিনের পরিচয় কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অনেক দিনের চেনা।

স্বরঙ্গমা নিঃশব্দে একটু হাসে।

॥ দুই ॥

ডিসেম্বরের সন্ধ্যা। সমস্ত লণ্ডন শহর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোগুলো যেন ধূসর ঘোমটায় ঢাকা। আগুনের পাশে আরাম চেয়ারে বসে শিশুদের মনস্তত্ত্ব পড়তে আর ভাল লাগছিল না স্বরঙ্গমার, একটা নির্জীব বিষণ্নতা মনকে অধিকার করেছে। আবহাওয়ার প্রভাব কি নিস্তেজ করে আনে মনটাকে! এই কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যা যেন বুকের ওপর চেপে বসেছে, বইয়েতে মনঃ-সংযোগ করবার আর একবার চেষ্টা করলো সে। শিশুদেব দেহ আর মনোরাজ্যের অপরিচিত অলিগলির মধ্যে বিচরণ করতে করতে কৌতূহল আর মমতা তার মনকে অভিভূত করে। কত চেনা অথচ কত অচেনা এই সব ছোট শিশু যাদের একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ আছে, অদ্ভুত এক বিস্ময় এবা!

চোখ তুলে স্বরঙ্গমা বাইরের দিকে তাকালো। আজ সাত দিন ধরে এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, স্লেট-রং আকাশ, সূর্যের মুখ দেখার জন্যে মন হাঁপিয়ে ওঠে। দেশের কথা মনে পড়ে, সেখানেও বৃষ্টি হয় কিন্তু এমন কুণ্ঠিত অর্ধোচ্চারিত বৃষ্টি নয়, সে বর্ষণ অজস্র অবারিত দুরন্ত। আবার যখন গভীর রাত্রে ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামে, গানের সুরের মত এক নিবিড় আবেশ মনকে জড়িয়ে ধরে, চোখের পাতায় যেন একটা নরম স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে। স্বরঙ্গমার মন চলে যায় সুদূর ভারতবর্ষে, প্রিয়জন কে আছে সেখানে তারই সন্ধান করতে, দুই চোখ বন্ধ করে সে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়, হাত থেকে বইখানা খসে পড়ে।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দে সচকিত সুরঙ্গমা সোজা হয়ে উঠে বসে, মেজে থেকে বইখানা তুলে রাখে তারপর দরজা খুলে দেয়। পাশের ঘরের মিস্ করঞ্জিয়ার হাসিমুখ দেখা যায়, বলে—কিগো ঘুমুচ্ছিলে নাকি? আস্তে আস্তে নক্ করছিলাম কোন সাড়া না পেয়ে জোরে ধাক্কা দিয়েছি, বিরক্ত করলাম না তো?

সুরঙ্গমা মুখে হাসি এনে বলে—একটুও না। এই রকম অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় তোমার সঙ্গ পেলে তো বেঁচে যাই, এসো গল্প করা যাক্।

—কিন্তু তোমাকে এই মুহূর্তে সঙ্গ দিতে পারছি না সু, সেজন্যে দুঃখিত। মিস্টার ভাণ্ডারকার এসেছেন, আমি তোমার কাছে এসেছি একটু চিনির জন্যে, কফি তৈরি করবো।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এখন তোমার মিস্টার ভাণ্ডারকারকে সঙ্গ দেওয়াই একান্ত প্রয়োজন, আমার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায় সুরঙ্গমা, চিনি নিয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। ওব চোখে চোখ পড়তেই সুরঙ্গমার মনে হয় প্রিয়মিলনের আবেশে ওর চোখ দুটি যেন স্বপ্নাতুর, সুরঙ্গমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মনের অপরিসীম ক্লান্তিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে সুরঙ্গমা উঠে দাড়ালো, গায়ে সবুজ ভারি কোটটা চাপালো, মাথায় স্কার্ফ বেঁধে পার্সটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। ফিন্‌স্‌বেরি পার্ক টিউব স্টেশনে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিট সময় লাগলো, আলোয় উজ্জ্বল প্ল্যাটফর্মে নেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুরঙ্গমা, মানুষের মেলা মনকে একাকীত্বের নির্জনতা থেকে মুক্তি দেয়। এখানে কুয়াশাও খানিকটে হালকা, দম বন্ধ হয়ে আসছে না, সে ট্রাফালগার স্কোয়ারের একটা টিকিট কিনলো।

সুরঙ্গমার একটা মানসিক বিলাস আছে, মাঝে মাঝে ট্রাফালগার

স্কোয়ারে এসে ফোয়ারার পাশে একটা বেঞ্চে বসে থাকে সে। বাতাসে ভেসে-আসা জলকণা তার চোখে মুখে লাগে, এই শীকরের স্পর্শ ভারি ভালো লাগে তার, মনের সমস্ত উত্তাপ যেন এতে শান্ত হয়ে আসে, দুই চোখ বন্ধ করে সে এটা উপভোগ করে। মনে পড়ে অনেকদিন আগে দাদার সঙ্গে একবার পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল, দুজনে সমুদ্রের ধারে বসে থাকতো, সাগর-জলে-ভিজে বাতাস তার মুখে চোখে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিয়ে যেত। কত সুখের ছিল মেঘমুক্ত মনের সেই দিনগুলি।

পিকাডিলি স্টেশন থেকে এবার বেকার্লু লাইনের ট্রেন ধরতে হবে, হঠাৎ সুরঙ্গমার কি মনে হল ওপরে উঠে এল, ভাবলো আর তো মোটে একটাই স্টেশন, হেঁটেই যাবে। পিকাডিলির আলোর উৎসব আজ কুয়াশায় ম্লান, গিনেসের ঘড়িতে পৌনে আটটা বেজেছে। লেস্টার স্কোয়ারের দিকে চলতে লাগলো সে, সব সিনেমা হলগুলো পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরলো চেয়ারিং ক্রস রোডে।

সামনেই দিন-রাত খোলা পোস্টঅফিস, এয়ার লেটার কিনতে ভেতরে ঢুকলো সুরঙ্গমা, একদম ফুরিয়ে গেছে, কালকে দাদাকে চিঠি লিখতেই হবে। এরপর ট্রাফালগার স্কোয়ারের দিকে চললো, বাঁ দিকের থিয়েটারে 'চার্লিজ আণ্ট' প্লে হচ্ছে, সুরঙ্গমা শুনেছে ওটা নাকি খুব মজার বই, ভাবলো একদিন দেখতে যেতে হবে।

সেণ্ট মার্টিনের গির্জার সামনে এসেছে এমন সময় কে যেন দূর থেকে ডাকলো—হ্যালো সু, কোথায় যাচ্ছ?

মুখ ফিরিয়ে সুরঙ্গমা দেখে তার কলেজের সহপাঠিনী পামেলা। মেয়েটি কাছাকাছি আসতেই সুরঙ্গমা বললো—প্যাম, তুমি এই কুয়াশার মধ্যে কি করে আমায় চিনলে?

মেয়েটি হেসে বলে—তোমার প্রিয় সুগন্ধি 'রব্ দ্য সোয়া'-র গন্ধটাই তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

—ঠিক বলেছ ওই সুগন্ধিটা আমার বড়ই প্রিয়, আর দেখ

ওরা আমার জন্যেই যে এই পারফিউমটা তৈরি করে, আমি না নিলে ওরা কি দুঃখিত হবে না? তুমিই বল।

সকৌতুকে সুরঙ্গমা হেসে ওঠে, পামেলাও হাসে। বলে—তোমার যেমন মিষ্টি স্বভাব, ওই সুগন্ধিটারও তেমনি মিষ্টি গন্ধ। আচ্ছা শোনো, তোমার যদি অন্য কোন কাজ না থাকে তবে এসো না আমাদের এই ফিনিক্স ক্লাবে, অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

সুরঙ্গমা বলে—ক্লাব আবার কোথায় এখানে?

—এই গির্জাতেই নীচের তলায়। চলই না, ভালো না লাগলে চলে যেও।

পামেলাকে সুরঙ্গমার বড় ভালো লাগে। প্রাণোচ্ছল এই তরুণী এমন অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে তার সঙ্গে যে তার বিষণ্ণ দিন-গুলিতে খুশীব আমেজ লাগে। দুপুর বেলায় রোজ কলেজে খাবার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় ক্যান্টিনে, অনভিজ্ঞ সুরঙ্গমাকে বলে দেয় কোন্ খাদ্যটা কি উপাদানে তৈরি, জিজ্ঞাসা করে কোন্টা খেতে তার ভালো লাগে। সুরঙ্গমার মুখ বিমর্ষ দেখলে নানারকম গল্প করে তাকে খুশী করবার চেষ্টা করে। সুরঙ্গমা বলে—বেশ তো, চল তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক্ কিন্তু আমার মত একটি অচেনা মেয়েকে দেখলে ওরা বিব্রত বোধ করবে না তো?

—চুপ করে এবার চলে এসো তো লক্ষ্মী মেয়েটির মত—এই বলে সুরঙ্গমার হাত ধরে টেনে সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়।

একটা ঘর তরুণ-তরুণীদের কোলাহলে হাসিতে মুখর। কোণের দিকে বিলিয়ার্ড টেব্‌ল আর অন্যধারে টেব্‌ল্-টেনিস খেলা হচ্ছে। ওরা দুজনে ঘরে ঢুকলে কয়েকটি কণ্ঠে পামেলার উদ্দেশে শুভসন্ধ্যা বিজ্ঞাপিত হল, পামেলাও সকলকে সম্ভাষণ জানালো, তারপর এগিয়ে গিয়ে বললো—আমার একটি বন্ধুকে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এসেছি, এ হচ্ছে সু।

এরপর সুরঙ্গমার দিকে চেয়ে বলে গেল—টেড্, ডিক্, টম্, জিমি, ডরোথি, পেগী, ব্রায়ান।

সকলকে হাসিমুখে অভিবাদন জানালো সুরঙ্গমা, ওরাও প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করলো।

পামেলা ওদের জিজ্ঞাসা করলো—পিটার কোথায়? ওকে দেখতে পাচ্ছিনা তো, বলেছিল আজকে আসবে!

—পিটার বোধহয় দশমবার টেট্ গ্যালারিতে পিকাসোর প্রদর্শনী দেখতে গেছে—দুষ্টুমির হাসি হেসে বললো ব্রায়ান।

—গেলেও ক্ষতি নেই, এক একখানি ছবির রস সারাজীবন ধরে উপভোগ করা যায় তা কি জানো তোমরা, অর্বাচীনের দল?

পেছন থেকে পিটারের গলা শুনে চমকে যায় ওরা, তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

—রাগ করো না ভাই পিটার—কথাটা ছুঁড়ে দেয় ডিক্—পিকাসোর আঁকা মানুষের মুখ আর ঘোড়ার মুখের মধ্যে কি তুমি কোন তফাত দেখতে পাও?

উত্তেজিত পিটার বলে—তোমরা শুধু বাইরের চেহারাটাই দেখ গভীরে তো প্রবেশ করতে চাও না, বাইরের আবরণকে সরিয়ে অন্তরের রূপকে যদি না আবিষ্কার করতে পার তবে তো তোমরা অন্ধ। পিকাসোর ছবি যদি তোমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্য না পায় তবে তোমাদেরই মনের দৈন্য প্রকাশ পাচ্ছে বলা চলে।

ডরোথি উষ্ণ হয়ে বলে ওঠে—এ তোমার নেহাতই জুলুম পিটার, তুমি কি বলতে চাও, যে-কোন বিষয়ে সকলেই তোমার সঙ্গে একমত হবে?

পিটার এবার শান্তভাবে জবাব দিল—না, তা বলতে চাইনে, তা যদি হতো তবে পৃথিবীটা বড় একঘেয়ে হয়ে যেতো। এখানে ডিক্ আছে ব্রায়ান আছে ডরোথি আছে তাই না বৈচিত্র্যও আছে।

ডরোথি ছাড়া সকলেই হাসলো, ডরোথি গম্ভীর হয়ে রইলো।

সুরঙ্গমা সকৌতুক দৃষ্টিতে প্রিয়দর্শন পিটারের মুখের দিকে চেয়ে ওর কথাগুলো উপভোগ করছিল। পামেলা ওর কানে কানে বলে—শিল্পী পিকাসোর অন্ধ ভক্ত পিটার, আর তা ছাড়া ও নিজেও ছবি আঁকে কিনা!

এরপর পিটারের দিকে চেয়ে পামেলা বলে—পিটার, সামনের শনিবার আমরা তোমার মুখে পিকাসো তথা আধুনিক চিত্রকলার ব্যাখ্যান শুনবো স্থির করেছি সুতরাং আজ এ-প্রসঙ্গ থাক—এসো তোমার সঙ্গে আমার বন্ধু সু'র আলাপ করিয়ে দি।

পিটারের এতক্ষণে সুরঙ্গমার দিকে দৃষ্টি পড়লো, সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো, দুহাত জোড় করে নমস্কার করে বললো—বেশী আশা করবেন না, আমার ভারতীয় আদব কায়দার জ্ঞান ঐ নমস্কার পর্যন্তই। আচ্ছা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি কিছু মনে করবেন না, মাস দুই আগে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আশাকরি সে কথা ভুলে যাননি?

সুরঙ্গমা হাসিমুখে উত্তর দেয়—আমার স্মৃতিশক্তিকে আপনি এতটা দুর্বল বলে ধারণা করেছেন এ বড় দুঃখের বিষয়। আপনি শিল্পী, সর্বদাই ভাবের জগতে থাকেন, সহজে লোককে চিনতে পারেন না কিন্তু আমরা মাটির মানুষ মাটিতে পা দিয়ে চলি তাই চেনা মানুষকে দেখা মাত্রই চিনতে পারি।

সুরঙ্গমার কথায় সবাই হেসে ওঠে। অপরিচয়ের গণ্ডি এক নিমেষে পার হয়ে সকলেই যেন খুব কাছে এসে পড়ে সুরঙ্গমার।

ফিনিক্স ক্লাবে ভারতীয় মেয়ের আবির্ভাব এই প্রথম, আর তাছাড়া, গির্জার সংশ্লিষ্ট এই ক্লাবের সব ছেলেমেয়েরাই অন্তরের মহিমায় উজ্জ্বল, পরকে আপন করে নেবার ব্রতই যেন নিয়েছে তারা, সুরঙ্গমাকে মধ্যমণি করে সবাই ঘিরে দাঁড়ায়।

সুরঙ্গমার ব্রীড়া জাগে মনে, যেন সে পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে, সবাই দেখছে তাকে, শরমে তখন তার মুখ অরুণাভ।

পামেলার মতো ভাল করে তো কেউ তাকে চেনে না। পামেলা জানে অনেক লোকের ভিড়ে কত অসহায় বোধ করে এই ভীরু মেয়েটি তাই মুহূর্তে তার মনোভাব আঁচ করে নিয়ে প্রসঙ্গান্তর এনে ফেলে সে বলে—শোনো সবাই, আমার একটা প্রস্তাব আছে, জানি না তোমরা সেটা কিভাবে নেবে।

সবাইয়ের দৃষ্টি পড়ে পামেলার ওপর, সুরঙ্গমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকায়।

পামেলা বলে—আগামী ইস্টারে আমরা সকলে আণবিক বোমা বিরোধী পদযাত্রায় যোগ দেব অলডার ম্যাস্টন শহরে, তোমরা সবাই রাজী?

—সর্বান্তঃকরণে—পিটারের সম্মতি সকলের আগে সোচ্চার হয় —এ অভিযানে যোগ দেবার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সকলের। কয়েকজন ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকের দম্ভ বজায় রাখবার জন্যে আমরা কিছুতেই এই পৃথিবীটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেব না।

সকলের কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে একসঙ্গে—কিছুতেই না, নিশ্চয়ই না।

পিটারের চোখের দৃষ্টি দৃপ্ত হয়ে ওঠে।

সুরঙ্গমা মুগ্ধ হয়, এদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হয়। ভালো কাজে মানব কল্যাণের ব্রতে এরা সবাই আগ্রহী, সেও সহজভাবে এদের আলোচনায় যোগ দেয়, তার নিজের মতকেও এদের সঙ্গে যুক্ত করে।

॥ তিন ॥

মে মাসের বেলাশেষের সূর্যের আলো তখনও আকাশে মিলিয়ে যায়নি। পিটার ট্রাফালগার স্কোয়ারে হঠাৎ আবিষ্কার করলো সুরঙ্গমাকে; খুশীতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কাছে এসে পাশে বসে বললো—তুমি?

সুরঙ্গমা তার ভাবমগ্ন চোখ দুটিকে পিটারের দিকে আস্তে আস্তে তুলে ধরলো। চিন্তার অতল সাগর থেকে যেন উঠে এল সে মানুষের ব্যবহারিক জগতে। এতক্ষণ পার্কের অন্যান্য লোকের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, আলাপের গুঞ্জন থেকে তার মন যেন একেবারে বিযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, সে দুই চোখ বন্ধ করে বসেছিল। একটু-খানি হাসবার চেষ্টা করে বললো—আমি প্রায়ই এখানে এসে বসি, আমার খুব ভাল লাগে।

পিটার শিল্পীর চোখে একবার দেখে নিল ফোয়ারার জলকণাসিক্ত সুরঙ্গমার সুন্দর ললাটখানিকে, তারপর বললো—সু, তুমি ভাবুক, তুমি নিশ্চয় কবিতা লেখো?

সুরঙ্গমা এবার হেসে উঠলো। বললো—না, আমি ভাবুক কিংবা কবি নই। আমি তো তোমায় আগেই বলেছি আমার মধ্যে বিশেষ রকম কোন গুণ নেই। তোমার ভাবুক মন ছবির মাধ্যমে তোমায় লোকের চোখে তুলে ধরে কিন্তু আমি নিরস গদ্য, ভাব আমার কাছ থেকে দূরে পালায়।

পিটার সহজভাবে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে তারপর আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু তোমার ওই চোখ দুটোকে আমার এত ভালো লাগে! তোমার চোখের মধ্যে আমি ভাবের যে গভীরতা দেখি আর কোথাও তা আমি পাইনি, আমি অনেক চেষ্টা করি তোমার ওই গভীর দৃষ্টিকে ছবিতে ধরতে।

সুরঙ্গমা ঈষৎ সলজ্জভাবে চোখদুটি নামিয়ে নিল; একটু পরেই মুখ তুলে হেসে বললো—পেরেছ ধরতে?

পিটার সরলভাবে উত্তর দেয়—না পারিনি; তবে চেষ্টা ছাড়িনি আমি, হয়তো কোনদিন সফল হবো।

সুরঙ্গমা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে জোরে হেসে উঠলো—বললো—এ দুশ্চেষ্টা তুমি ছাড়ো তো। পিকাসোপন্থীরা তো শুনেছি বাস্তবের পূজারী, বাস্তবকে নিয়েই তো তোমাদের জগৎ।

পিটার দুঃখিত ভাবে বলে উঠলো—না, না সু, এ তোমার ভুল ধারণা। বাস্তবকে অবলম্বন করে তার মধ্যে ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই তো শিল্পীর ধর্ম, শিল্পীর ধ্যানকে তুমি ধারণা করবার চেষ্টা করো, নইলে দুঃখ পাবো।

সুরঙ্গমা আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেললো তারপর মৃদুস্বরে বললো—জগতে এত লোক থাকতে আমার কাছে তোমার এত আশা কেন পিটার, আমি তো বিদেশিনী। পামেলাকে ডরোথিকে তোমার শিল্প ভাবনায় ভাবুক করে তোলো, আনন্দ পাবে।

পিটার এবার একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো—ডরোথিকে আমার স্বপ্নের জগতে টেনে আনবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ও কিছুই বুঝতে চায় না, সব হেসে উড়িয়ে দেয়।—পিটারের গলায় হতাশার সুর।

হাসিমুখে সুরঙ্গমা বলে—অধ্যবসায়ে কি না হয়। আমার চোখের ভাবকে ছবিতে ধরবার চেষ্টা না করে ডরোথির ভেতরকার সৌন্দর্যবোধকে জাগাবার সাধনা কর নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করবে।

পিটার চুপ করে রইলো মাথা নীচু করে। সুরঙ্গমা বললো—কথা বলছো না যে ?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পিটার মুখ তুলে বললো—সু, এযে আমার কত বড় ব্যথা তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ওর রূপ আমাকে টানে কিন্তু ওর রূঢ়তা আমায় ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। শিল্পে সাহিত্যে কিছুতেই ওর বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, ওর মনে স্পর্শ-কাতরতা স্থান পায় না। ওর বাইরেটা এত কমনীয় কিন্তু অন্তরে এমন দৈন্য কেন ? কেন ওর মধ্যে অনুভূতি জাগে না, সুন্দরের স্পর্শ পেয়ে ওর মনের মণিকোঠা কেন আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে না, কেন ও অন্ধের মত বধিরের মত সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

পিটারের প্রশ্নের আকুলতা সুরঙ্গমার মনকে বিচলিত করে, সে সহসা কোন উত্তর দিতে পারে না। পিটারের ব্যথিত মুখের দিকে

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে থাকে তারপর আস্তে আস্তে বলে—পিটার, মানুষ তো জীবনে অনেক চাওয়া থেকেই বঞ্চিত হয় তাই বলেই মানুষ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। তোমার শিল্পীসত্তা নিজের সৃষ্টির আনন্দেই মগ্ন হয়ে থাকতে পারে, তুমি কেন দুঃখকে আমল দেবে? তুমি তো পরম সুখী, তোমার সৃষ্টিই তোমার ঐশ্বর্য, তার মধ্যেই তোমার সম্পূর্ণতা। কিন্তু ভেবে দেখো যার মধ্যে তোমার মতো অবলম্বন করবার কিছু নেই, সে কি ধরে দাঁড়াবে? তার বঞ্চনার জীবনে তো কোন সান্ত্বনা নেই, পিটার!

সুরঙ্গমার কণ্ঠে এমন এক সুরের আভাস যে, পিটারের বিস্মিত দৃষ্টি ওর আনত মুখের ওপর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলো, আকস্মিক ভাবে এই কথাটা তার মনে চমক দিল যে, মেয়েটি হয়তো সুখী নয়। এই বিদেশিনী মেয়েটির সম্বন্ধে সে তো কিছুই জানে না। ওর চোখে মাঝে মাঝে যে অনির্বচনীয় ভাব জেগে ওঠে, যা দেখে মনে হয় চেনা-জানার জগৎ ছাড়িয়ে মন বুঝি ওর কোন অনির্দেশে উধাও হয়ে গেছে, সেই গভীর উদাস দৃষ্টির মধ্যে কি কোন অব্যক্ত ব্যথা লুকিয়ে আছে?

স্কোয়ারের অন্যদিকে হঠাৎ পিটারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, সেখানে ডরোথি তার একটি বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে দেখে পিটার বললো—সু, ডরোথিকে দেখতে পাচ্ছি ওর সঙ্গে পেগীও আছে ওদের ডেকে আনি, তোমার সঙ্গে তো ওদের পরিচয় আছে।

পিটার উঠে ওদিকে এগিয়ে গেল, ওদের কাছে গিয়ে বললো—ডরোথি, তুমি এখানে! তুমি কি জানতে যে আজ আমি এখানে আসবো?

ডরোথি মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বললো—মোটেই না। তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ানো আমার কাজ নয়। দেখতেই পাচ্ছ পেগীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসেছি। কিন্তু তোমার তো দেখছি সঙ্গিনী জুটে গেছে তবে আর এদিকে আসা কেন?

পিটার সাগ্রহে বললো—চল ডরোথি, তোমরা স্নু'র সঙ্গে গল্প করবে, মেয়েটি ভারি ভালো।

—ভালো লাগাটা তো বুঝতেই পারছি, একঘণ্টা থেকে আলাপ হচ্ছে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি পেয়েছো তুমি ওর মধ্যে? একটা অতি সাধারণ মেয়ে, দেখতে তো মোটেই সুন্দরী নয়।

—জানিনে, সে-বিচার করিনি কিন্তু মেয়েটি সত্যিই ভালো, ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে তোমরাও সেটা স্বীকার করবে।

ডরোথি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো—ও, তোমার সঙ্গে খুব বুঝি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে? তা' তোমার ভালো তোমারই থাক আমার তাতে কোন দরকার নেই। আমি ওকে যথেষ্ট চিনি, কি অহংকারী মেয়েটা, কারু সঙ্গে কথাই বলে না। প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাবে এসেছিল তোমরা ওকে নিয়ে কি কাণ্ডই না করলে, যেন কি এক দুর্লভ রত্নই পেয়েছো! সেই লোভে ও মাঝেমাঝেই ওখানে আসে।

পেগী রাগ করে বললো—ডরোথি, তুমি ভারি সিনিক্ গোছের হয়ে উঠছো; কারুকে ভালো চোখে দেখ না। আমার কিন্তু মেয়েটিকে ভালো লাগে, এমন শান্ত!

ডরোথি বিদ্রূপতীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো—যাও না তুমি পিটারের সঙ্গে; ওর সঙ্গে কথা বলে কৃতার্থ হয়ে এসো গে। আমি এখন বাড়ী ফিরছি।

পিটার অনুনয় করে বললো—ডরোথি, আমি কথা দিয়ে এসেছি তোমাদের নিয়ে ওর কাছে যাব, এখন যদি না নিয়ে যাই সেটা কি অশোভন হবে না?

ডরোথি ব্যঙ্গ করে বললো—খুব যে আগ্রহ দেখছি! প্রেমে পড়েছো কিনা, তাই তোমার প্রাণপণ চেষ্টা ওর কাছে ভালো হতে কিন্তু আমার মোটেই আগ্রহ নেই। তোমার ইচ্ছের সঙ্গে আমাকেও যোগ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই তো! আমি জানি ভারতীয় মেয়েরা এদেশে আসে শুধু ইউরোপীয়ান ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে,

যেমন ক'রে হোক তাদের হাত করবার চেষ্টা করে, তাই ভারতীয় মেয়েদের আমি ঘৃণা করি।

পেগী ওকে বাধা দিতে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ছিঃ ডরোথি, তুমি কতটুকু জানো ওই মেয়েটির সম্বন্ধে? ওদের সমাজের রীতি-নীতি চাল-চলন কিছুই জানো না, তবু একটা বিরূপ মন্তব্য করবে?

ডরোথি ক্রুদ্ধস্বরে বলে—থামো পেগী, তুমি জানো না ঐ মেয়েটা প্রায়ই পিটারের সঙ্গে আর্ট গ্যালারিতে দেখা করে। পিটার আমাকে এ বিষয়ে কখনও কিছু জানায়নি, গোপন করে গেছে। কিন্তু ওই দুঃসাহসী মেয়েটা আমাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে নিজেই আমায় এ কথা বলেছে। আমি বুঝতে পারি ও আমাকে জানাতে চায় যে, পিটারের কাছে আমার চেয়ে ওর দাম অনেক বেশী।

হঠাৎ মুখের ওপর রুমাল চেপে ডরোথি কান্না থামাবার জন্যে একদিকে ছুটে চলে গেল। পিটার এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়েছিল, এবার অত্যন্ত আহত কণ্ঠে বলে উঠলো—উঃ ডরোথি!

পেগী ছুটে গিয়ে ডরোথির হাত ধরলো, ভর্ৎসনার সুরে বললো—ছিঃ ডরোথি, এ সব কথা বলা তোমার ভারি অন্যায়। চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই, তুমি ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছো।

ডরোথির হাত ধরে পেগী তাকে টেনে নিয়ে গেল, যাবার আগে দূর থেকে ডরোথি ভিজে চোখ তুলে পিটারের ওপর অগ্নিবৃষ্টি করে গেল।

পিটার আস্তে আস্তে সুরঙ্গমার কাছে ফিরে এলো। সুরঙ্গমা তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলো, ওর মনে হল পিটারের মুখের চেহারায় যেন বেদনার ছোপ লেগেছে। একটিও প্রশ্ন না করে সুরঙ্গমা বললো—পিটার, দেখ কেমন সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছে। সেই যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিনও রংয়ে রংয়ে চারদিক ছেয়ে গিয়েছিল, ওই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে

থাকবে। যেদিন আকাশ আর পৃথিবীতে রংয়ের হোলি খেলা চলবে সেদিন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকলেও তরুণ শিল্পীটির কথা আমার মনে পড়বে।

পিটারের মুখে চোখে শিল্পীসুলভ স্থৈর্য ফিরে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত সে স্থির চোখে চেয়ে রইলো তারপর বললো—সু, তোমার মন যেন আমার মনকে ছুঁয়ে যায়, কেন বুঝতে পারিনে! কিছুদিন পরে হয়তো তুমি ভারতবর্ষে তোমার আপনজনের মধ্যে ফিরে যাবে কিন্তু তুমি যেখানেই থাকো তোমার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনও হারিয়ে যাবে না। আর তুমি আমাকে একজন দুঃখী বলেই মনে রেখো।

—ছিঃ পিটার, তরুণ জীবন তোমার, ভেঙ্গে পড়া তোমার ধর্ম নয়। জীবনে ঝড়ঝঞ্ঝা আছে, আবার এমনি সুন্দর রঙীন সন্ধ্যাও ফিরে আসে। পিটার একটু চুপ কবে থাকে তারপর বলে—সু, কিছুতেই মনকে ওর থেকে ফেরাতে পারিনে, আঘাতের দুঃখ পাই তবুও।

পিটারের করুণ কণ্ঠ সুরঙ্গমার মনকেও ব্যথিত করে, সে আশ্বাসেব সুরে বলে—পিটার, তোমার ভালবাসা যদি একাগ্র হয় তবে তা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না, ওকে তোমার কাছে আসতেই হবে।

পিটারের হাতখানি উষ্ণ করতলে নিয়ে সুরঙ্গমা সাগ্রহে একটু চাপ দেয়।

॥ চার ॥

সেদিন সুরঙ্গমা একটা বই হাতে নিয়েই শুয়েছিল কিন্তু মনটা কিছুতেই বইয়ের পাতায় বসছিল না, ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল এলোমেলো চিন্তার ভেলায়।—

ভালোবাসা যদি সত্যিই একাগ্র হয় তবে কি তা কিছুতেই ব্যর্থ হয় না? মিস্ করঞ্জিয়ার মুখে শোনা চন্দ্রিকার কথা সুরঙ্গমার মাঝে

মাঝেই বেদনার সঙ্গে মনে পড়ে। রাজস্থানের সেই সুন্দরী গুণবতী মেয়ে চন্দ্রিকা। জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছিল। ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি সে, প্রতিকূল অবস্থা তাকে পরাভূত করেছিল।

নার্সিং ট্রেনিং নিতে আমেরিকা গিয়েছিল, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরের এক হোটেলের শেফ (Chef)-কে ভালবাসলো। গোয়ানিজ কৃশ্চান, বিদেশে এসে চাকরীর সংস্থান করে নিয়েছিল। দেখতে কিছু সুন্দর নয়, চরিত্রেও অসাধারণত্ব কিছু নেই কিন্তু কেমন করে যে ভালবাসা হল, কিসের ওপর ভিত্তি করে, তা ধারণা করা যায় না। বিয়ে হল তাদের, একটি সন্তানও হল তারপর দুজনে লণ্ডনে চলে এসে স্বাধীন ভাবে একটা হোটেল খুললো। প্রথমে হোটেলটা ভালই চললো, জাহাজী লস্কররাই প্রধানতঃ খদ্দের, জাহাজ থেকে নামে, পোর্টের কাছাকাছি ওই হোটেলটাতে ভারতীয় রান্নার স্বাদ পায়, সস্তাও পায়, ওই হোটেলেই এসে ভিড় করে। কিছুদিন বেশ ভালভাবেই চললো তারপর কি জানি কেন খদ্দেরের টান পড়লো, হোটেল আর চলে না।

চন্দ্রিকা বললো, পরদার আড়াল থেকে আমাকে বেরুতে দাও, এ তো ভারতবর্ষ নয় যে, আমায় বোরকা পরিয়ে রাখবে। আমি খদ্দের যোগাড় করবো।

স্বামী বিদ্রূপ করলো—রূপ দেখিয়ে নাকি? চন্দ্রিকা বলে—দোষ কি, এদেশে তো ব্যাবসার খাতিরে রিসেপ্‌সনিস্ট মেয়ে রাখেই, ভয় নেই তোমার ভালবাসার ভাগে কমতি পড়বে না, আমাকে বাধা দিও না।

স্বামী চোখ রাঙিয়ে কড়া সুরে বললো—না, তোমায় খদ্দের যোগাড় করতে হবে না, তুমি রান্না করো আর ছেলে মানুষ করো।

এর মধ্যে তৃতীয় সন্তানটি জন্ম নিয়েছিলো, দারিদ্র্যের চাপে চন্দ্রিকা হাঁপিয়ে উঠলো, স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ছিল। দারুণ শীতে ছেলে

মেয়ের যথেষ্ট জামাকাপড় নেই, নিজেদেরও ওই অবস্থা তার ওপর পুষ্টিকর খাবারের একান্ত অভাব। অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকে গেল, হোটেল তুলে দিতে হল। চন্দ্রিকা অনুনয় করে বললো, আমাকে তাহলে চাকরি করতে দাও। স্বামীর মত হল না। এদিকে তার নিজের শীর্ণদেহ, ছেলেমেয়ে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে রাস্তায় লুটো-পুটি খায়, নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে মিশে অকথ্য গালিগালাজ শেখে। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, নেই পোশাক, নেই পুষ্টি। অসহ্য হয়ে উঠলো চন্দ্রিকার জীবন।

এরপর ও মরিয়া হয়ে উঠলো, কড়া নিষেধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে মধুর হেসে খদ্দেরকে আহ্বান করে, আদর আপ্যায়নে সরস আলাপে তাদের মুগ্ধ করে, দেখতে দেখতে হোটেল আবার জমজমাট হয়ে উঠলো। ছেলেদের চেহারার আর পোশাকের দৈন্যদশা ঘুচলো কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বাধলো খিটিমিটি, তার রুদ্ধ আক্রোশ দিনরাত ওকে দগ্ধ করতে লাগলো।

ঝগড়াঝাটি তো লেগেই আছে, তারপর মারধোর আরম্ভ হল। মত্ত অবস্থায় শুধু স্ত্রী নয় ছেলেমেয়েদের ওপরও চললো অকথ্য অত্যাচার। পাড়ার লোকের কাছে খবর পেয়ে সোস্যাল ওয়ার্কাররা তদন্ত করতে এল, দেখলো ছেলেমেয়ের গায়ে মারের অসংখ্য দাগ, কারো দাঁত ভেঙে গেছে, কারো কপাল কেটে গেছে, মাথা ফেটেছে কারো। বাপের কিছু জরিমানা হয়ে গেল, নিষ্ঠুর আচরণের অজুহাতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তারা অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দিল, মা আপত্তি করলো না।

এবার চন্দ্রিকার ছুটি। নিরাসক্ত নিরানন্দ দিন, শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনে বিতৃষ্ণা। সংসার আর ওকে টানতে পারলো না, জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জর হয়ে মেয়েটি একদিন সংসার ত্যাগ করে কোথায় চলে গেল কে জানে। পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো মাটি

খুঁজে পেয়েছিল, না ঝড়ের মুখে ঝরাপাতার মতো ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কেউ বলতে পারে না, মিস্ করঞ্জিয়াও তা জানে না।

এ-কাহিনী সুরঙ্গমার বুকের নিভৃতে কোথায় বাসা বেঁধেছিল কে জানে, মাঝে মাঝে বেদনার সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে যেত, মনে হত চন্দ্রিকার নয় এ ব্যথা যেন তার নিজের। মনে প্রশ্ন আসে চন্দ্রিকা তো একনিষ্ঠ হয়েই স্বামী সন্তান সংসারকে ভলোবেসেছিল তবু সে ব্যর্থ হল কেন ?

এই কেন-র উত্তর হাতড়াতে গিয়ে সুরঙ্গমার মনে পড়ে গেল পিটারের কথা—সুরঙ্গমা এর মধ্যে কিছুদিন নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কলেজে পামেলার সঙ্গে দেখা হত বটে কিন্তু বেশী কথা হত না। অনেক দিন পিটারের সঙ্গে তার দেখা হয়নি শুনেছিল ও নাকি ওর ষ্টুডিওতে ছবি আঁকার মধ্যে ডুবে আছে। পামেলার কাছে জেনেছিল পিটারের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে ডরোথি তার নিজের দেশে চলে গেছে, আয়ার্ল্যাণ্ডের এক গ্রামে ওর বাড়ী। পামেলা আর পেগী সেদিন অনেক চেষ্টা করেও ওকে বোঝাতে পারে নি। শুনে সুরঙ্গমা পিটারের জন্যে দুঃখিত হল।

পামেলা বলে—পিটার সৌন্দর্যের পূজারী, ডরোথি ওর আদর্শ, ওর রূপকে ভিত্তি করে ও ছবি আঁকে কিন্তু ডরোথির মধ্যে ও যা চায় তা খুঁজে পায় না, তাই দুঃখ পায়।

সুরঙ্গমা উত্তর দিয়েছিল—কিন্তু পামেলা, দৈহিক রূপই তো শিল্পসাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়, সুরূপ-কুরূপ সমৃদ্ধি-দৈন্য সুখ-দুঃখ এই সব নিয়েই তো জীবন, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া তো চলে না। ও এখনও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় পৌঁছুতে পারেনি, নইলে এতদিন দুঃখকে অতিক্রম করে ও আনন্দলোকে পৌঁছে যেত। কিন্তু দেখ পামেলা, এটা ওর জীবনের সন্ধিক্ষণ, ও সত্যিকারের শিল্পী, দুঃখের পরীক্ষায় একদিন ও উত্তীর্ণ হবে এ আমি বিশ্বাস করি।

এই কথাই সেদিন সুরঙ্গমা পিটারকেও বলেছিল। বলেছিল

—দুঃখের সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনকে সম্পূর্ণ করে জানা হয় না পিটার। বেদনাই তো সৃষ্টির উৎস, দুঃখের সাগর মন্থন করে যে অমৃত তোমার জন্যে উঠবে তাই তোমার সৃষ্টিকে করবে মহান। তুমি তো জানো গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত স্পেনের জন্যে যে-প্রচণ্ড অন্তর্বেদনা পিকাসোর অপূর্ব সৃষ্টি গুয়েরনিকার (Guernica) জন্ম দিয়েছিল, বুক-নিংড়ানো সে-যন্ত্রণা ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। সত্যিকারের শিল্পীর ব্যথা এমনি বিস্তৃত, এমনি বিরাট, এমনি মহৎ। এ-বেদনা প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে মানুষের মনের বদ্ধ দুয়ার, অন্ধ দৃষ্টিকে খুলে দেয়, এ ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখবিলাস নয়, তোমাকে বৃহতের সাধনা করতে হবে পিটার।

নির্বাক হয়ে খানিকক্ষণ পিটার সুরঙ্গমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—সু, তুমি জীবনের সবদিককে এমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারো দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই! হয়তো তুমি ভারতবর্ষের মেয়ে বলেই আমি তোমার মধ্যে এই দুর্লভ জিনিস খুঁজে পাই, আমাদের সমাজের জীবনযাত্রা এমন চঞ্চল অস্থির যে, সেখানে স্থিতির গভীরতার স্থান নেই।

সুরঙ্গমা আস্তে আস্তে বলে—না, পিটার তা ঠিক নয়। তুমি জীবনের কতটুকু দেখেছো, তোমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সমগ্রকে বিচার করতে যেও না, ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

পিটার অন্যমনস্কের মতো একদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর বলে—তুমি সত্যি বলেছ সু, আমাকে সসীম রূপের মোহ থেকে, ছোট গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, বৃহতের সাধনায় জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে।

—পিকাসো ইম্প্রেসানিজম্-এর কারাগার থেকে তাঁর শিল্প ভাবনাকে যথেচ্ছাচারের উদার আকাশে মুক্তি দিয়েছিলেন, হ্যাঁ যথেচ্ছাচারই আমি বলবো একে, বাঁধা-ধরা বিধিকে অগ্রাহ্য করে নিন্দাস্তুতিকে তুচ্ছ করে শিল্পীর মন মুক্তির আলোয় নিজেকে

আবিষ্কার করেছিল; সেদিন বৃহতের আবির্ভাব পূর্ণতা দিয়েছিল তাঁকে। সু, তুমি একদিন বলেছিলে শিল্পীর দুঃখ নেই, আনন্দের জগতে তার স্থান, তোমার এই কথাকে স্মরণ করে আমি বলিষ্ঠ চিন্তাধারার অনুসরণ করব, দুর্বলতার দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করব। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি আমার গ্রামের বাড়ীতে চলে যাচ্ছি সেখানে নিভৃতে শিল্পের সাধনা করব, তোমার প্রেরণাই আমাকে শক্তি দেবে।

একটুখানি থেমে পিটার আবার বলে—তোমার কাছে এসে আমি বুঝতে পারি তোমার জীবন-দর্শনের গভীরতা; সেখানে আমি কত ছোট।

সুরঙ্গমা হাসতে হাসতে বলে—পিটার, আমাকে অত উঁচুতে তুলে দিও না, হঠাৎ এক সময় মাটিতে পড়ে যেতে পারি। তুমি কি সব যা তা বলছ তার ঠিক নেই!

পিটার বলে—যা তা নয়, এ যে আমার মনের কথা, সু।

সুরঙ্গমা পিটারের হাতখানি হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—পিটার, আমাকে অসামান্য মনে করে সম্ভ্রম করে দূরে সরিয়ে দিও না, এই বিদেশিনীকে বন্ধু মনে করে মনের কাছেই টেনে নিও তা হলেই আমি সুখী হব।

পিটারের সে-দিনকার কথা ভাবতে ভাবতে সুরঙ্গমা নিজেকে হারিয়ে ফেলে তার ফেলে-আসা দিনগুলোর মাঝে।

॥ পাঁচ ॥

বাড়ীটাতে জীবনের চিহ্ন!

কলকাতা শহরে পাশের বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ লোকের কমই থাকে কিন্তু তবু কোনো বাড়ী থেকে যে কোনো কারণে ভাড়াটেরা উঠে গেলে পড়শীদের মনে কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা দেখা দেয়।

দীর্ঘদিনের পরিচয়ে আত্মীয়তা হলেতো বটেই, অপরিচিত হলেও দিনের পর দিন দেখা চেনা-মুখগুলির জীবন-ধারণের ধারাধরনের পরিচিতিতে অভ্যস্ত মনে তালা-ঝোলানো দরজা ও বন্ধজানালাগুলো পীড়া দেয়। এ রকম মানসিকতা বোধহয় সমাজ বদ্ধ মানুষের অভ্যাসের ফল, মানুষের অবচেতন মন এর প্রভাব এড়াতে পারে না।

বাড়ীটাতে জীবনের চিহ্ন। শুধু তাই নয়, সুখী সৌখীন রঙ্গীন জীবনের আভাস। দুদিন আগেও বাড়ীটা 'টু লেট'-এর প্লেট বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল, সেটা অপসারিত হয়েছে।

প্রতিবেশীদের কৌতূহল মেটাতে আগন্তুকরা জানালায় বারান্দায় বা ছাদের উন্মুক্ত জায়গায় এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি তবু বাড়ীর দরজায় যখন ট্যাকসি এসে দাঁড়ালো, উঁকিঝুঁকি দিয়ে তারা দেখেছিল —ট্যাকসি থেকে নেমে এল একটি সুন্দরী তরুণী আর একজন সুদর্শন পুরুষ। মনে হল চুন-কলি ফেরানো, জানলা দরজায় রং দেওয়া বাড়ীটা যেন সেই মুহূর্তে প্রাণ পেল। প্রতিবেশীদের মনে অকারণ আনন্দ হয়তো নির্জন বাড়ীর নিস্তব্ধতা ভাঙলো বলেই। চাকরদের জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ, তাদের কথার আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর কোনো নির্দেশের বাণী শোনা যায় না, জানলা বা দরজায় পরদার আড়াল থাকাতে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না।

দু-একদিন চললো জিনিস পত্রের স্থান নির্বাচন ও সন্নিবেশ করার ব্যস্ততা ; ব্যস্ততা আছে কিন্তু সোরগোল নেই। তারপর বাড়ীখানা আবার যেন ঘুমিয়ে পড়লো। চাকররা নির্দিষ্ট সময়ে বাজার-ব্যাগ নিয়ে বা অন্য কাজে বেরিয়ে যায়—তারপর ফেরে। রান্নার সুগন্ধ ভেসে আসে, বাসন পত্রের ঝনৎকার কানে আসে কিন্তু উন্মুখ পড়শীরা যা আশা করে গৃহবাসীদের কণ্ঠস্বরের আওয়াজ, চাকরদের ডাকাডাকি বকাবকি সে-সব কিছুই শোনা যায় না। বাড়ী নিঃশব্দ, চাকররা যেন মেসিনের মত কাজ করে যায় কোন ব্যতিক্রম নেই ;

আর বিস্মিত প্রতিবেশীরা দেখে ছাদে-মেলা রঙীন শাড়ী ব্লাউস শান্তিপুরী ধুতি ইত্যাদি সুখী ও সৌখীন জীবনের পরিচয়।

একেবারে পাশের বাড়ীর বৌ সুলতা নতুন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আলাপ জমাবার আশায় মাঝে মাঝেই ছাদে ওঠে কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। একদিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘের আড়ম্বর দেখে শুকনো কাপড় তুলতে সে ছাদে উঠেছে হঠাৎ পাশের বাড়ীর ছাদে চোখ পড়তেই দেখে সেই মেয়েটি! ছাদের আলসের ওপর শরীরের ভার রেখে ডানহাতের ওপরে আলগোছে চিবুকখানি ঠেকিয়ে উর্ধ্বনেত্রে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চল, নির্বিকার যেন পটে আঁকা ছবি। সুলতা বিস্মিত চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে থাকে।

নববর্ষার শ্যামসমারোহ রৌদ্রদগ্ধ আকাশটাকে স্নিগ্ধপ্রলেপে ঢেকে দিয়েছে, মেঘ নিবিড় সন্ধ্যা ঘনকালো হয়ে নেমে আসছে। বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে, হয়তো দূরে কোথাও নেমেছে বাতাসে তারই শীতল স্পর্শ। অপলক স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, মাথায় কাপড় নেই অবিন্যস্ত কালো চুলগুলো পিঠের ওপর দুলছে, চোখে মুখে উড়ে পড়ছে তবু হাত দিয়ে সরায় না, যেন জীবন্ত মানুষ নয়, মাটির পুতুল।

অবাক হয়ে সুলতা ভাবে—এ আবার কেমন ধারা মেয়ে বাবা, দুপুর বেলা রোদে চুল এলিয়ে চুল শুকোয় না, বিকেল বেলা চুল বেঁধে গা ধুয়ে সাজ করে ছাদে বেড়ায় না, পাড়াপড়শীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করে না। সন্ধ্যেবেলা কোন দিন ছাদে ওঠে যেদিন ঘনঘটায় আকাশ কালো হয়ে আসে, সেই বর্ষণোন্মুখ মেঘের দিকে কি যেন প্রত্যাশার চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে, দেখে অদ্ভুত মনে হয়। বুঝতে পারা যায় ওর কোন কাজ নেই, নেই কোন ব্যস্ততা। সুলতার ভারি ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু অপরপক্ষে

কোন উৎসাহ নেই তাই সঙ্কোচ বোধ হয়। দু চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, আড়চোখে মেয়েটির দিকে চাইতে চাইতে সুলতা নীচে নেমে যায়।

বৃষ্টি নেমেছে বেশ্ জোরে, মেয়েটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের ওপর জল ঝরে পড়ে, আরামে চোখের পাতা বুজে আসে। অনেকক্ষণ পরে তার সর্বাঙ্গ যখন ধারা বর্ষণে সিক্ত হয় তখন সে আস্তে আস্তে নেমে আসে।

রাত অনেক হয়েছে। আশে পাশের বাড়ীগুলোর আলো নিভে গেছে। গির্জার ঘড়িতে দু'টার ঘণ্টা বাজলো। রিমঝিম বৃষ্টির নূপুর বেজেই চলেছে একটানা ঝিঁঝির ডাকের মত মন্থর শব্দ। পাশাপাশি ঘর, খট করে মাঝখানকার দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ কানে এল, ধীরপদে শুভেন্দু ঘরে ঢুকলো। কয়েক মুহূর্ত সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বললো—এমন করে আর কতদিন চলবে?

সুরঙ্গমা বিছানায় শুয়ে বালিসে মুখ গুঁজে ছিল, ঘরে নীল রংয়ের মৃদু আলো জ্বলছে। জলে-ভেজা চোখ দুটো সে আস্তে আস্তে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তুলে ধরলো। এ প্রশ্ন তো তারও, দিনের পর দিন এই প্রশ্নই তো সে নিজেকে করে চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশে দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টিকে তুলে ধরে এই প্রশ্নকেই তো সে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাঠায়, এমন করে আর কতদিন চলবে? সে জিজ্ঞাসার কোন উত্তর আসে না, নিবিড় কালো মেঘান্ধরাত্রে সে-জিজ্ঞাসার উত্তর পথ হারিয়ে ফেলে আকুলিবিকুলি করতে থাকে।

॥ ছয় ॥

দুজনেই মেডিক্যাল কলেজে পড়তো। মেয়েটি থাকতো বাড়ীতে, ছেলেটি কলেজ হোস্টেলে। পরিচয় হয় যখন ছেলেটি ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে, মেয়েটি সেকেণ্ড ইয়ারে। একই কলেজে পড়ে, চোখের চেনা ছিল কিন্তু মুখের আলাপ ছিল না, হঠাৎ সেদিন আলাপ হয়ে গেল।

মেট্রো সিনেমায় একটা নাম-করা ছবি এসেছে, বেশ ভিড় হয়েছিল, সুরঙ্গমাও দেখতে গিয়েছিল। ছবি শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে এসে সুরঙ্গমা ওর গাড়ী খুঁজে পাচ্ছিল না, কোথায় গাড়ী পার্ক করেছে বুঝতে না পেরে ছুটোছুটি করছিল এমন সময় শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা, শুভেন্দু এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে বললো—গাড়ী খুঁজে পাচ্ছেন না বোধহয়, নাম্বার বলুন, আমি খুঁজে দিচ্ছি—সুরঙ্গমা কৃতজ্ঞ চোখে শুভেন্দুর মুখের দিকে চাইলো।

শুভেন্দু সুরঙ্গমাকে হলের মধ্যেই দেখেছিল, সুরঙ্গমা ওকে লক্ষ্য করেনি তাই ওকে দেখে একটু অবাক হল, বললো—আপনিও ছবি দেখতে এসেছিলেন?

অনাবশ্যক প্রশ্ন, কিন্তু শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলার উপলক্ষটুকু খুশীতে সুরঙ্গমার মনকে ভরে দিল।

শুভেন্দু হাসিমুখে উত্তর দিল—হ্যাঁ। ছবিটা কেমন লাগলো আপনার?

—খুব ভালো লাগলো, নাম শুনেই এসেছিলাম।

সুরঙ্গমা ওর চোখ দুটো শুভেন্দুর দিকে তুলে ধরলো।

—আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি গাড়ীটাকে খুঁজে আনি।

সুরঙ্গমাকে শুভেন্দু দরজা খুলে দিল, ভদ্রতার খাতিরে সুরঙ্গমা বললো—যদি—অসুবিধে না হয় আপনিও আসুন না।

শুভেন্দু একটু হেসে জবাব দিল—মাপ করবেন, আমার একজন বন্ধু সঙ্গে আছেন।

নমস্কার করে শুভেন্দু সরে দাঁড়াল, সুরঙ্গমাও যাবার আগে নমস্কার জানিয়ে গেল।

তারপর কলেজে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট কথা হয়েছে। ভাল-লাগার পরে যে অবস্থা আসে তাকে বলা হয় ভালবাসা বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের মধ্যে, এখানে দুজনের মনই সাড়া দিয়েছিল।

সান্ধ্য কলকাতায় আলোর সমারোহ, লোকের কোলাহল কিন্তু ওরা চায় একটু আড়াল, একটু নির্জনতা, মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। খানিকটে ঘনিষ্ঠতা হলে সুরঙ্গমা একদিন বললো—চলুন না আমাদের বাড়ীতে একদিন, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি'।

শুভেন্দু সঙ্কুচিত হলো, সে একটু ভীরু প্রকৃতির, থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু আমাকে দেখে ওঁরা যদি কিছু মনে করেন, মানে—মানে আপনার সঙ্গে দেখে। খিল খিল করে হেসে ওঠে সুরঙ্গমা—মনে তো কিছু করবেনই, মানে যতটা অনুমান করা সম্ভব, তা আপনার কোন ভয় নেই, আমার দাদা খুব ভদ্রলোক, মনে কিছু করলেও আপনাকে বিন্দুমাত্র অসম্মান করবেন না, সে গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিচ্ছি। আর আমার বৌদি, সি ইজ এ ভেরি গুড্ গার্ল। আমাদের বাড়ীতে আর কোন লোক নেই।

তবু শুভেন্দুর সাহস হয় না। আরও কিছুদিন কেটে যায়, ঘনিষ্ঠতা আবও নিবিড় হয়, সম্বোধন আপনি ছেড়ে তুমি'র পর্যায়ে নামে।

একদিন সকালবেলা সুরঙ্গমা সঞ্জয়কে বললো—দাদা, এক ভদ্র-লোক আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন, আমার একজন বন্ধু।

সঞ্জয়ের একটু দেরি করেই ঘুম ভাঙ্গে। সকাল বেলা অফিসের

জন্য কাগজ পড়বার সময় করে উঠতে পারে না তাই এক হাতে খবরের কাগজ নিয়ে পড়া আর অন্য হাতে খাবার কাজ একসঙ্গে চালিয়ে তাকে সময় সংক্ষেপ করে নিতে হয়। সুরঙ্গমার কথা শুনে কাগজ আর খাবারের প্লেট দুই-ই ঠেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে বসলো। সকৌতুকে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললো—তোর বন্ধু ভদ্রলোক! আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন? আরে এ-ও তো একটা খবর হচ্ছে। তা' ভাল করে বল্, কোথায় থাকেন, কি করেন, কি উদ্দেশ্যে এ অভাজনকে স্মরণ করেছেন। শর্ট হ্যাণ্ড তো শিখিনি খুকী যে, তোর সংক্ষিপ্ত কথা ক'টাকে চোখ বুলিয়েই বুঝে নেব, বিদেশী বন্ধু না ভারতীয়, বাঙালী না বেহারী, গুজরাটি না মারাঠী সব কিছু খুলে বল্। কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হবে তাও বল্।

সুরঙ্গমা হাসিমুখে বললো—আঃ দাদা, কি যে আরম্ভ করলে!

সঞ্জয় বলে—আরে রবীন্দ্রনাথ যেন কি লিখে গেছেন, 'বল বল আজ কি করিব সাজ কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস?'

স্নিগ্ধা টি-পট থেকে চা ঢালছিল, সঞ্জয়ের বিচিত্র ভঙ্গী দেখে হেসে ফেললো, বললো—তুমি কেন সাজ করবে? সাজবে তো সুরঙ্গমা।

সঞ্জয় সুরঙ্গমার চেয়ে সাত আট বছরের বড়। পড়াশোনায় অনুরাগ ছিল খুব, ছাত্রজীবন ছিল প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল। বিদেশ থেকে সসম্মানে ডিগ্রী নিয়ে এসে একটা ভাল ইউরোপীয়ান ফারমে ঢুকেছিল, কাজকর্ম জলের মত বোঝে, অল্পদিনের মধ্যে অবিশ্বাস্যরকম উন্নতি করেছে।

সুরঙ্গমা বললো—উদ্দেশ্যটা তো তুমিই খুঁজে বার করবে। আপাততঃ এইটুকু তোমাকে জানাবার, ভদ্রলোক মেডিক্যাল স্টুডেন্ট, ওঁর এবার ফিফ্‌থ ইয়ার, শীগ্‌গিরই ফাইন্যাল দিয়ে বেরুচ্ছেন।

—তাই নাকি? তা তোর তো মোটে থার্ড ইয়ার, এ রকম অসম বন্ধুত্ব কি করে হয়? রোস্ রোস্ ভেবে দেখি তা বন্ধুত্ব হতে আর বাধা কি, আরে খুকি, তুই তো তাহলে বড় সড় হয়ে উঠলি মনে হচ্চে, কত যেন বয়স হল তোর?

—আচ্ছা দাদা, কোথায় কি ঠিক নেই তুমি কুষ্ঠি ঠিকুজী নিয়ে পড়লে। লোকটি কি প্রকৃতির, কি চায় আগে সেটা বুঝে নাও।

সঞ্জয় বলে—ঠিক বলেছিস, তোরা মেয়েরা ভারি সাবধান। আমরা চলি অন্ধের মতো অগ্রপশ্চাৎ ভাবি না, কোথায়ও হার স্বীকার করতে হলে আমাদের মাথা কাটা যায় বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। এই দেখ তোর বৌদিকে কেমন করে জিতে নিলাম।

সুরঙ্গমা হেসে ফেললো—ভাগ্যিস বৌদির মত শান্ত মেয়েকে পেয়েছিলে তাই এত পৌরুষের গর্ব। সুভদ্রা যদি অর্জুনের রথে সারথি হয়ে বল্গা না ধরতো তবে অর্জ্জুনকে ওখানেই নাকে খত দিয়ে ফিরতে হত। বৌদি যদি আমার বন্ধু অমিতার মত তুখোড় মেয়ে হতো তবে তোমার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াতো তা বেশ কল্পনা করতে পারছি।

স্নিগ্ধা সুরঙ্গমার দিকে চেয়ে বললো—ইস, ভাইবোনের বক্তৃতা আরম্ভ হলে আর উপায় নেই, এদিকে যে চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সঞ্জয় হাত ঘড়িটার দিকে এক নজরে চেয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো, বললো—এঃ দেরি হয়ে গেছে, আচ্ছা আমি ঠিক পাঁচটায় অফিস থেকে ফিরছি।

শুভেন্দুর সঙ্গে আলাপ হয়ে সঞ্জয়ের খুব ভালো লাগলো। ছেলেটির সংযত মার্জ্জিত কথাবার্তা, গম্ভীর প্রকৃতি সঞ্জয়কে আকৃষ্ট করলো। চেহারাও বেশ চমৎকার।

মাঝে মাঝেই এ বাড়ীতে আসবার জন্যে সে শুভেন্দুকে আমন্ত্রণ জানালো।

শুভেন্দু মাঝে মাঝে আসে। সঞ্জয়ও বাইরে থেকে খোঁজ খবর নিতে থাকে। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারে ওর বাবা উত্তর প্রদেশে একটি কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপনায় খ্যাতি আছে। আধুনিক ভাবাপন্ন শিক্ষিত পরিবার। এখানে বিয়ে হলে আপত্তির কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে ছেলেটি সব দিক দিয়েই ভালো।

তবু মনে সংশয় আসে। এক সময় নিভৃতে সুরঙ্গমাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, কত দিনের আলাপ, ছেলেটিকে ওর কি রকম লাগে, ভবিষ্যতের জন্যে ওরা কিছু ভাবছে কিনা।

সুরঙ্গমা লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করে থাকে। সঞ্জয় আবার বলে—দেখ্ খুকি, ভাল করে বুঝে নিবি। যথেষ্ট মার্জিত, বুদ্ধিমান তবু রুচি প্রকৃতিতে তোর সঙ্গে মেলে কি না মনে মনে বিচার করে দেখবি। তুই তো তা হলে অনেক দিন হলো ওর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিস্, না?

এবার সঞ্জয় আস্তে আস্তে বলে—তোর ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে কোনো অশান্তি না আসে তাই আমি চাই।

সঞ্জয় আর পরিহাসতরল নয়, রীতিমত গম্ভীর। দাদার স্নেহের শঙ্কা সুরঙ্গমার চোখকে সজল করে।

॥ সাত ॥

সুলতা কয়েকদিন দ্বিধা করবার পর একদিন একটু উচ্চকণ্ঠে ও ছাদ থেকে ডাকলো—একটু শুনবেন?

প্রথমটাতে সুরঙ্গমা বুঝতে পারেনি, দ্বিতীয়বার ডাকতে সচকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে চাইলো, বললো—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ ভাই, এদিকে একটু আসুন না।

সুরঙ্গমা সরে এসে দাঁড়ায়। সুলতা বলে—ক'দিন হল

এসেছেন আলাপ করতে বড্ড ইচ্ছে করে তা' আপনি চুপচাপ থাকেন বলে সাহস পাইনে।

সুরঙ্গমা একটু হাসে। সুলতা বলে—আজ ভাই আপনার ওখানে বেড়াতে যাব।

—বেশ তো, আসুন না। সুরঙ্গমা গলায় আগ্রহের সুর আনতে চেষ্টা করে।

সুলতা সত্যিই আসে, কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে। কৈফিয়তের সুরে বলে—কি করি ভাই, ঘরে তো কেউ নেই, ওকে নিয়েই এলাম। উনি তো অফিস থেকে সেই সাতটায় ফিরবেন।

সুরঙ্গমা হাসিমুখে বলে—বেশ তো, বসুন।

সোফাতে বসে সুলতা ঘরের চারদিকে তাকায়, বলে—কি সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছেন ভাই, ফার্নিচারগুলো বেশ দামী, না?

সুরঙ্গমা মাথা নীচু করে বসে থাকে। সুলতা বলতেই থাকে—আমরা ভাই গরীব মানুষ, ফ্ল্যাটটুকুর ভাড়া দিতেই জিব বেরিয়ে যায়, ঘর সাজাব আর কি করে। তবু গরীবের বাড়ীতে একদিন যাবেন ভাই।

সুলতা প্রায়ই আসে। মাঝে মাঝেই অনুরোধ করে, অশোভন দেখায় বলে বাধ্য হয়েই সুরঙ্গমা একদিন ওদের বাড়ীতে যায়।

ছোট ফ্ল্যাট। ওরই মধ্যে বড় ঘর খানায় একখানা খাট, খান দুইচার ছবি ঘরের দেয়ালে, তার মধ্যে ঠাকুর দেবতার ছবিই বেশী, একখানা ছোট আয়না।

সুরঙ্গমাকে সতরঞ্চি পেতে বসিয়ে সুলতা বলে—আমি এই আসছি, ততক্ষণ এর সঙ্গে গল্প করুন।

এক বছরেব ছেলেটাকে খেলনা দিয়ে সুরঙ্গমার সামনে বসিয়ে হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে যায়। মিনিট দশেক পরে একপেয়ালা ধুমায়মান চা আর প্লেটে খান দুই বিস্কুট নিয়ে হাজির হয়। সুরঙ্গমা বিস্মিত হয়ে বললো—এসব কি করলেন?

সুলতা বলে—তাতে আর কি হয়েছে, তুমি যে আমাদের বাড়ীতে এসেছো এই আমার ভাগ্যি। আর আপনি নয়, এবার থেকে তুমি, দুজনেই দুজনকে তুমি বলব, কেমন? তোমার নামটি কি ভাই?

এই মেয়েটির দ্রুত বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষমতা দেখে সুরঙ্গমা অবাক হয়; মেয়েটি কি সাবলীল, যেন ঝরনা ধারা বয়ে চলেছে। ক'দিন ও তাব ওখানে গেছে কিন্তু ওকে চা দেবার কথা কখনও মনেও হয়নি তো! ঘনিষ্ঠতা করার কথা চিন্তায়ই আসেনি। উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে তার জন্ম, সংযম ও সুরুচির শিক্ষা ছিল সেখানে, বাবা ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, মা-ও ছিলেন বিদূষী। আহারে বিহারে ব্যবহারে সর্বত্র ছিল পরিমিতি।

অপরিমিত কথা বলা, যেখানে সেখানে বেড়ানো, কোন ব্যাপারে অযথা আগ্রহ প্রকাশ করা, নিজেদের সম সমাজের গণ্ডির বাইরে অবাধে সর্বসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা—এগুলো নিষিদ্ধ ছিল। সুরঙ্গমা ভাবে, তাই মনটা যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে, নিজের কাছেই তার লজ্জা বোধ হয়।

সুরঙ্গমা কি ভাবছে না ভাবছে সুলতাব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে নিজের মনে বকে যায়—এই খোকাটা জানো ভাই বাপের প্রাণ, আর ছেলেটাও কি এমন নেমক হারাম, এত খাওয়াই ধোওয়াই যত্ন করি তবু উনি অফিস থেকে এলে একেবারে পাগল হয়ে যায়, অফিসের কাপড়চোপড়সুদ্ধই একবার ওকে কোলে নিতে হয়, খানিকক্ষণ আদর পেলে তবে হাতমুখ ধুতে দেয়। আর তাই কি খেতে দেবে? মিষ্টিটা দুহাতে চটকায়, হালুয়া লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, উনি কোলে বসিয়ে মজা দেখেন, আমার যে কী রাগ হয়!

সুলতা খিল খিল করে হাসে। সে হাসি দেখে সুরঙ্গমার মনে হয় না যে, সত্যি সত্যি ওর রাগের কারণ ঘটে। মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে সুরঙ্গমা, মুখখানি ওর যেন খুশীর আভায় ঝলমল্ করছে, কোথায় দারিদ্র্য, এযে ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণতা।

স্থলতা নিজের মনে বলে যায়—তুমি ভাই কি সুন্দর! দুগাছা রুলি পরেছ হাতে তাতেই কি সুন্দর মানিয়েছে! কিছু মনে কোরো-না, আচ্ছা এয়োস্ত্রী মানুষ হাতে শাঁখা আর নোয়া নেই কেন? সিঁদুরও তো পরনি, এসব বুঝি আজকালকার ফ্যাশান? তা আমরা তো ওসব ফ্যাশান জানি না ভাই, লেখাপড়াও বেশী শিখিনি, তুমি বোধহয় খুব লেখাপড়া জানো, না?

সুরঙ্গমা চুপ করে থাকে। মেয়েটির অকপট সারল্য ভালো লাগে। স্বল্প পরিচয়ের ক্ষেত্রে নিজের পারিবারিক জীবনকে সে এমন অনায়াসে মেলে ধরতে পারে দেখে আশ্চর্য লাগে। স্কুল কলেজের জীবনে বন্ধু তার ছিল, বিশেষ করে অমিতা ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবু তার কাছেও এমন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে নিজের মনোভাবকে খুলে ধরতে সে পারেনি। তার নিজের জগতে সে ছিল একা, তার মনের গহনে সঙ্গ দেবার মত কারুকে সে পায়নি। তার প্রকৃতির সঙ্গে কারুর মিল হয়নি, তাই তার পড়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে মাঝে মাঝে সে বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ করে আত্মমগ্ন হয়ে বহুক্ষণ কাটিয়ে দিত। ওকে ঠিক বুঝতে না পেরে ওর সহপাঠিনীরা বলতো—ও মেয়েটা মিস্টিক, ওকে চেনা যায় না, গর্বিত নয় অথচ অমিশুক। ওর বন্ধু অমিতা বলতো—ওকে সহজে বোঝা যায় না কিন্তু ও ভারি মিষ্টি।

কৈশোরে বাপ-মাকে হারাবার পরে সুরঙ্গমার একমাত্র বন্ধু ছিল তার দাদা। পরম প্রিয়, নিকটতম, যাকে অবলম্বন করে তার একুশ বছরের জীবন লতার মত বেড়ে উঠেছিল। তার সব অভিমান অভিযোগের স্থান ছিল ঐ দাদা। দাদা ওকে যেমন করে বুঝতো তেমন করে আর কেউ বুঝতে পারতো না। সেই দাদা সেদিনও বুঝতে পেরেছিল শুভেন্দুর দিক থেকে সুরঙ্গমার মন ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে তাই মনে মনে প্রার্থনা করেছিল শুভেন্দু যেন সুরঙ্গমার উপযুক্ত হয়, শুভেন্দুকে পেয়ে সুরঙ্গমার জীবনে যেন সম্পূর্ণতা আসে।

॥ আট ॥

স্কুল ও কলেজ জীবনে সুরঙ্গমার একমাত্র বন্ধু ছিল অমিতা যাকে সে সত্যি করেই ভালবাসতে পেরেছিল, যদিও সুরঙ্গমা সায়েন্স নিয়েছিল অমিতা ছিল আর্টস-এর ছাত্রী। আই-এস্‌সি পাশ করে সুরঙ্গমা মেডিক্যাল কলেজে ঢোকে আর অমিতা সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে থাকে। এরপর থেকে ওদের দেখাশোনা কমই হয়েছে। হঠাৎ সুরঙ্গমার বিয়ে হবে শুনতে পেয়ে অমিতা আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখা হলে বললো—কিরে আর দুটো বছর সবুর সইলো না, একেবারে ডিগ্রীটা নিয়ে বেরিয়ে বিয়ে করতিস্‌ ?

সুরঙ্গমা হাসলো। অমিতা জানতো ওর মনের গঠন এমনি যে, কোথাও নির্ভর করতে পারলে ও বেঁচে যায়, একলা পথ চলার মত বলিষ্ঠতা ওর মধ্যে নেই, ও ভারি নরম। বললো—আমি তোর জন্যে এই ভয়ই পেয়েছিলাম। যাক যা করছিস্‌ বেশ করছিস্‌, এবার তোর বরের গল্পটা একটু কর শুনি।

সব কথা শুনে অমিতার মুখ হাসিতে ভরে গেল, বললো—আরে এযে শুভেন্দুদা, লাভ্‌ ম্যারেজ, তাই বল্‌; দুজনে একই লাইনের, যোগাযোগ তো ভালই ঘটেছে দেখছি!

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করলো—তুমি বুঝি ওকে চিনতে ?

—কিযে বলিস্‌ তুই, ওযে আমার নিজের মাসতুতো দাদা, এখানে আমাদের বাড়ীতে ওর সব সময় যাওয়া আসা। বাবার নামে মেসোমশাইয়ের চিঠি নিশ্চয়ই ওখান থেকে আসবে এবার বৌভাতের নেমন্তন্ন নিয়ে। কি মজার কাণ্ড হল বল দেখি!

অমিতা খুশীতে সুরঙ্গমাকে জড়িয়ে ধরলো, বললো,—তুই বন্ধু থাকতে থাকতে বৌদি হয়ে গেলি মজা নয় ?

সুরঙ্গমা হেসে বললো—কোন্‌ সম্বন্ধটা তোমার ভালো লাগে ?

—ছুটোই।

সুরঙ্গমা বলে—শুনেছি অনিন্দ্যবাবু জার্মানি থেকে ফিরে এসেছেন। তোমার এই শুভদিনটিতে কোথায় থাকবো জানি না, যেখানেই থাকি নিশ্চয়ই আসবো, তুমি তো বাগ্‌দত্তা হয়েই আছো, উৎসবের অনুষ্ঠানই শুধু বাকী।

—দাঁড়া না, আগে এম-এ'টা দিয়ে নি; তোর মত বোকা কিনা, মাঝ দরিয়ায় নাও ভাসিয়ে অকূলে ডুবে মরি! তা তোর কোন ভয় নেই, যে কাণ্ডারী পেয়েছিস্, পার তোকে করেই নেবে।

সুরঙ্গমা বলে—তুমিই বা অকূলে ডুববে কেন, তোমার কর্ণধার তো হাল ধরতে প্রস্তুতই আছেন।

অমিতা ভ্রূভঙ্গী করে বলে—কিন্তু আমাকেও তো প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ সুরঙ্গমার মনে পড়লো কলেজ জীবনের একদিনের কথা। সুকেশী অমিতা নিবিড় চুলের ভার বেণীবদ্ধ করে কলেজে আসতো, শোভন সুদীর্ঘ বেণী তার সহজেই চোখকে আকৃষ্ট করতো। একদিন কলেজের একটি ছেলে ওর পেছনে আসতে আসতে ওকে শুনিয়ে বলেছিল—

'বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।
কে বলে শারদশশী ও মুখের তুলা,
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।'

ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, গালাগালি করেনি, সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসিতে মুখ ভরিয়ে ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল, 'ভারতচন্দ্র' পড়েছেন বুঝি? পড়ে হজম করতে পারেননি মনে হচ্ছে।

ছেলেটি সরে পড়েছিল। এ নিয়ে অমিতা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানায়নি। ওর ব্যক্তিত্বকে ছেলেরা ভয় করতো।

আর একদিনের কথা মনে আছে, ওরা যখন সেকেণ্ড ইয়ারে

পড়ে তখন আন্তর্কলেজ ডিবেট হয়েছিল। তর্কের বিষয় ছিল, স্ত্রী-স্বাধীনতার সুফল ও কুফল। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ও একে একে যুক্তির শরক্ষেপ করতে লাগলো, মহাত্মা রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী সকল মহাজনের যুক্তির স্রোত টেনে এনে রবীন্দ্র সাগরে মিশিয়ে দিয়ে যেন সমস্ত অব-মানিতা নারীর প্রতিভূ হয়ে ও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা ?'

সেদিন ওর টানা ভ্রূ এম্‌নি ভঙ্গীতে ও উর্ধ্বে টেনে তুলেছিল দেখে ছেলেরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। শ্রোতা মেয়েরা আনন্দে দিয়েছিল হাত তালি। বিচারকের বিচাবে অমিতা পুরস্কার পেয়েছিল।

সে দিনের কথা মনে করিয়ে দিলে অমিতা হেসে ফেললো, বললো—বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম রে তখন, এখন অনেক বড় হয়ে গেছি।

একটু থেমে আবার বললো—জীবনের পথে সতর্ক হয়ে পথ চলতে হয় সুবঙ্গমা, নইলে পথের পাথরে ঠোক্কর লাগে। বিয়ে করবার আগে আমার নিজের মনকে ভাল কবে বুঝে নিতে চাই।

অমিতার বলিষ্ঠ চিন্তাধারাকে সুরঙ্গমা ঠিক অনুধাবন করে উঠতে পারে না, সে চুপ করে থাকে।

শুভেন্দু দারজিলিং-এ হাসপাতালের এসিস্ট্যাণ্ট সার্জন হয়ে সুরঙ্গমাকে নিয়ে সেখানে চলে গেল। নীড় বেঁধে দুজনে মুখোমুখী হয়ে, গুঞ্জন করে শুভেন্দু আর সুরঙ্গমা। দৈহিক মিলনের মধ্যে আর কোন বাধা নেই, নেই সমাজের বিধিনিষেধ, বিয়ের মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে দুজনে এক হয়ে গেছে। এ যেন তাদের কাছে এক পরম বিস্ময় বলেই মনে হয়। শুভেন্দু দুই হাতে জড়িয়ে সুরঙ্গমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

জীবনে বসন্তের দোলা লেগেছে, তৃণে পুষ্পে হরিতে লোহিতে

মনের বনে রঙের সমারোহ, গন্ধেভরা বাতাস মনকে উদ্‌বেল করে, বুক ভরে তারা সে বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়। দু'জনে বেড়াতে যায় ঘুম পাহাড়ের দিকে, সিঞ্চল লেকে নৌকোয় চড়ে, সূর্যোদয় দেখতে টাইগার হিলে ওঠে।

সুরঙ্গমার কেশে বেশে চলনে বলনে উচ্ছ্বাস, দুরারোহ জায়গায় শুভেন্দুর হাত ধরে। মনে পড়ে অমিতার সেই কথা—যে কাণ্ডারী পেয়েছিস্, পার তোকে করেই নেবে।

স্নিগ্ধাকে প্রায়ই চিঠি লেখে, তাতেও মনে রং লাগে, সঞ্জয় দেখে শুনে সুখী হয়, নিশ্চিন্ত হয়।

॥ নয় ॥

অমিতা দুইহাতে তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললো—আগামী পয়লা আষাঢ় আমরা একটা উৎসব করব বাবা, মহাকবি কালিদাসের স্মরণ উৎসব, তুমি তার সভাপতি হবে।

ডক্‌টর রায় হেসে বললেন—আরে, আমি তো অঙ্কের ডাক্তার, সংস্কৃতের ধারে কাছেও কখনো ঘেঁষিনি, এ রকম একজন অজ্ঞকে সভাপতির আসনে বসালে যে লোকে হাসবে।

—ইস্, তোমার মত বিজ্ঞ ক'জন আছে? তুমি অস্বীকার কোরোনা বাবা, ও আসনে তোমাকে ছাড়া আর কারুকে মানাবে না।

—ওটা তোর বাড়িয়ে বলা হল কিন্তু! যাই হোক তোর অনুরোধ স্বীকার করে না নিলে তো আর তোর মুখের দিকে চাইতে পারা যাবে না, সেখানেই আষাঢ়ের মেঘ নেমে আসবে।

অমিতা হেসে ফেললো—এই তো লক্ষ্মী ছেলে। আমি তাহলে সুধীসজ্জনদের নামে যে চিঠি যাবে তার একটা খসড়া করে ফেলি। জনকয়েক সাহিত্যিককে তো ডাকতে হবে, মহাকবির স্মরণ সভা না

হলে জমবে কেন, আর জানাতে হবে আমাদের যাঁরা বন্ধু, সাহিত্যের রসগ্রাহী আছেন, তাঁদের, কি বল বাবা?

—বেশ তো, তবে উৎসব অনুষ্ঠানের পরে একটা ছোট রকমের ভোজন উৎসবেরও ব্যবস্থা রাখিস্, শুধু সাহিত্য চর্চায় পেট ভরবে না।

—ওসব আমি জানিনে, এ বিষয় তুমি মার সঙ্গে পরামর্শ কোরো। আমি যাচ্ছি, এখন কত কাজ যে আমার।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মহাকবি কালিদাসের স্মরণ সভায় তাঁদের উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে, বিশেষ করে তাঁদের উপস্থিতিই উৎসব বাসরকে সার্থকতা দান করবে এই কথা উল্লেখ করে কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হল, আর দেওয়া হল কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকে।

স্কটিশচার্চ কলেজের সংস্কৃতেব অধ্যাপক কুশল মৈত্র, তিনিও একটা চিঠি পেলেন। অনিন্দ্য নিমন্ত্রণ পত্র তো পেলই উপরন্তু মিসেস্ রায়ের হাতে লেখা ভাবী জামাতার নামে বিশেষ চিঠি একখানা। অমিতা তার সহাধ্যায়িনী কয়েকটি মেয়েকে নিজের মুখেই বলেছিল।

উৎসবের আগের দিন কুশল বাইরে বেরুচ্ছিল এই সময়ে হঠাৎ অমিতাকে আসতে দেখে সে বিস্মিত হল। ব্যস্ত হয়ে বললো—আমি তো আপনার উৎসব অনুষ্ঠানের চিঠি পেয়েছি, আমি নিশ্চয়ই যাব, আপনি নিজে আবার কেন কষ্ট করে এলেন? বসুন।

অমিতা বসে পড়ে বললো—আপনি বোধহয় বেরুচ্ছিলেন আমি এসে বাধা দিলাম, কিন্তু আমার যে বড় জরুরী দরকার।

অমিতার স্বরে ব্যাকুলতা।

কুশল বসলো, শান্ত কণ্ঠে বললো—না, আমার বাইরে যাবার কোন তাড়া নেই। আপনি কি আমায় কিছু বলতে এসেছেন?

—হ্যাঁ। দেখুন, লোকজন তো ডেকেছি কিন্তু কি কি হবে তার

প্রোগ্রাম এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। দু'তিন দিন ধরে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এখন বুঝতে পারছি এ বিষয়ে কারু সাহায্য নিতে হবে, আমার একার কাজ নয়; কিন্তু এখন তো আর সময়ও বেশী নেই। আর প্রধান অতিথি কাকে করবো বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

অমিতার কণ্ঠে ব্যাকুলতা। একটু থেমে তারপর বলে—আপনার পরামর্শ চাই, আপনি যদি অনুগ্রহ করে—এইটুকু বলে অমিতা থেমে গেল।

বি-এ ক্লাসে অমিতা কুশলের ছাত্রী ছিল। কুশলের চমৎকার পড়াবার ভঙ্গী, বিশুদ্ধ সুললিত উচ্চারণ, উৎকৃষ্ট আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও অমিতা ওর একজন গুণমুগ্ধ ছাত্রী ছিল। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে অবধি কুশলকে ও আর দেখেনি, ওর বাড়ীতেও কখনো আসেনি তাই খানিকটা শঙ্কা নিয়েই ও এখানে এসেছিল। সসঙ্কোচে বললো—আপনার হয়তো অনেক কাজ তবু আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।

কুশল বলে—বেশতো অসঙ্কোচে বলুন, আমার যতটুকু সাধ্য আপনাকে সাহায্য করবো।

অমিতা বললো—আপনাকে এর মধ্যে একটা বড় অংশ নিতে হবে, মহাকবির কাব্য সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে ওখানে, সে জিনিসটা দামী হবে মনে করছি।

কুশল প্রশ্ন করলো—আমাকেও বলতে হবে কিছু ?

অমিতা সাগ্রহে বলে—হ্যাঁ।

একটু ভেবে নিয়ে কুশল বললো—আচ্ছা। দামী হবে কিনা জানিনে তবে সাধ্যমত চেষ্টা করবো। আর প্রোগ্রাম যা করেছেন আমার কাছে দিয়ে যান ভেবে চিন্তে দেখি কি করা যায়। আপনাকে আর আসতে হবে না আমিই কাল সকালে আপনাদের ওখানে যাব। আর প্রধান অতিথিও আমিই ঠিক করবো।

এতখানি অযাচিত সহানুভূতির জন্যে অমিতা প্রস্তুত ছিল না। নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলতে পেরে ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রণাম করবার জন্যে নত হতেই কুশল সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল—একি! একি? এ কি করছেন আপনি?

অমিতা হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো—আমি তো আপনার কাছে পড়েছি।

কুশল একটু হাসলো, বললো—গুরুগিরি করলেই প্রণাম পাবার অধিকার জন্মায় বলে মনে করিনে, আর তাছাড়া আমি কারু প্রণাম নিই না।

এই বলে সে নিজেই হাত তুলে অমিতাকে নমস্কার করলো। অপ্রতিভ অমিতাও দুইহাত জোড় করে ওকে নমস্কার দিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ দশ ॥

সভাগৃহ ফুলপাতায় মনোরম ও রুচিসম্মতভাবে সাজানো হয়েছে। ওর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে অমিতা নিজে ঘর সাজিয়েছে। একপ্রান্তে একখানা চন্দন কাঠের ছোট চৌকিতে রেশমী কাপড় বিছিয়ে তার ওপর মহাকবির কাব্যগ্রন্থগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তার চারদিক ঘিরে শুভ্র যুঁই ফুলের মালা, সামনে দুটি রক্তপদ্মের কোরক। কোন মেয়ের শিক্ষিত হাতের আলপনা চৌকির চারপাশ ঘিরে বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সামনে একসারি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা, একপাশে একটি পিতলের ধুনুচিতে ধুনা, ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ জ্বালানো, গন্ধে ঘরকে সুরভিত করেছে।

এ সবই অমিতার পরিকল্পনা। ক্লাসিক কবির স্মরণ সভায় সবদিক দিয়ে প্রাচীন পন্থারই অনুসরণ করা হবে তাই চেয়ারের বদলে ঘরের মেঝে জুড়ে গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একে একে অভ্যাগতজন দেখা দিতে লাগলেন, গৃহস্বামী হাসি-মুখে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন, অমিতা সকলের ললাটে শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ক্রমে সকলে আসন গ্রহণ করলেন, মেয়েরা সভাপতিকে প্রণাম করে একপ্রান্তে গিয়ে বসলো।

সকলের শেষে এলেন অনিন্দ্য চৌধুরী। তাঁর বিজাতীয় পরিচ্ছদের উপর সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। ডঃ রায় ঈষৎ বিমর্ষ হলেন, অমিতার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। অন্য কারু চোখে সেটা ধরা পড়বার কথা নয় কিন্তু অমিতার বন্ধু মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না কারণ তারা জানতো যে অনিন্দ্য অমিতার বাগ্‌দত্ত স্বামী, তার আসাতে অমিতার মুখখানা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে সকলের অলক্ষ্যে অনিন্দ্যের কোটের প্রান্ত একটু আকর্ষণ করে মুহূর্তের মধ্যে অমিতা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

বসবার ব্যবস্থা দেখে অনিন্দ্য হকচকিয়ে গিয়েছিল, অমিতার পেছনে এবার সে-ও ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একান্তে ডেকে নিয়ে অমিতা চুপি চুপি বললো—তোমাকে তো আমি আগেই টেলিফোন করে বলেছিলাম যে, দেশী পোশাকে আসবে, এতগুলো লোকের মধ্যে কি অশোভন দৃশ্য হল বল তো?

অনিন্দ্য অসন্তুষ্ট হয়ে বললো—কেন, এটা কি স্বদেশী মিটিং নাকি যে, বিদেশী পোশাক চলবে না? কিন্তু আমার তো ধুতি পাঞ্জাবী নেই, দিনে প্যাণ্ট কোট পরি রাত্রে নাইট ড্রেস পরে শুই, তোমরা যে একেবারে চেয়ারের ব্যবস্থা রাখবে না তাতো আমার ধারণায় আসেনি।

—রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, আমি বাবার ধুতি আর গরদের চাদর বার করে দিচ্ছি পাশের ঘরে গিয়ে পোশাকটা বদলাও।

অনিন্দ্য দুষ্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে বললো—ও আমি পারবো না, ধুতি পরা আমার বহুকাল অভ্যেস নেই।

অমিতা অনুনয় করলো—ডোন্ট্ বি সিলি মাই ডিয়ার।

অনিন্দ্য বলে—তার চেয়ে আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

পাশের ঘরেই ধরিত্রী দেবী ছিলেন ওদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে চাপা গলায় মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন—ও এখানেই বসবে। মনে কর, যদি কোন ইউরোপীয়ান হতো তবে কি সে ধুতি পরে আসতো? তোর যত জোর জবরদস্তি। এসো বাবা, তুমি এই চেয়ারখানা টেনে এই দরজার সামনে বোসো, এখান থেকেই তোমার ওদের সঙ্গে যোগ থাকবে।

এই বিশ্রী ব্যাপারটাতে অমিতার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল কিন্তু তার আর এখানে দেরি করবার সময় ছিল না, প্রোগ্রাম ছিল তার হাতে, সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নামের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে কুশল নিজে তাঁর কাছে গিয়েছিল। প্রবীণ অধ্যাপক তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি, প্রধান অতিথিরূপে সাহিত্য সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে স্বস্তিবাচন পাঠ করলেন তারপর সভার কাজ আরম্ভ হল। কয়েকটি মেয়ে সমবেত কণ্ঠে মেঘদূত কাব্যের পূর্বভাগ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি শ্লোক সুললিত ভাবে আবৃত্তি করলো। আবৃত্তি অন্তে হাততালি না দিয়ে সভাজন প্রাচ্য প্রথায় সাধুবাদ জানালেন। প্রদীপের আলোতে ফুল ও ধূপধুনার গন্ধে ঘরখানিতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, এরই মধ্যে কুশল মঞ্চে করে এসে দাঁড়ালো। শুভ্র ধুতি ও উত্তরীয় তার উন্নত গৌর দেহকে যে শোভনতা দিয়েছিল তাতে সভাস্থ সকলেরই দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হল। এর পরে মহাকবির কাব্য আবৃত্তির সঙ্গে আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তার কণ্ঠস্বর যখন কখনো ধীরে কখনো গম্ভীরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করতে লাগলো তখন

উপস্থিত বিদ্বজ্জন এই নবীন অধ্যাপকের ভাবগ্রাহিতায় মুগ্ধ হলেন, অনেকক্ষণ পরে যখন তার ঝংকৃত কণ্ঠ থেমে গেল তখন তাঁদেব উচ্ছ্বসিত সাধুবাদে ঘর মুখরিত হল।

সর্বশেষে সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ অন্তে তাঁকেও সাধুবাদ প্রদান করা হল।

অনুষ্ঠানের শেষ অঙ্কে অভ্যাগতদের জলযোগের পর্ব, সেখানেও কুশলের কর্মকুশলতার প্রমাণ পাওয়া গেল। সমাগতজনকে কুশলের আপ্যায়ন দেখে অমিতার মনে হল তার এই আয়োজনেব সফলতার দায়িত্ব যেন কুশল নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বিস্মিত ও বিমুগ্ধ ডঃ রায় কুশলের বিদায়ের সময় বল্লেন—আমি তো বুঝতেই পারছিলাম না যে, অমিতা যে কাজের সুচনা করেছে তা কেমন করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, একমাত্র আপনার আন্তরিক চেষ্টাতেই ব্যাপারটা এমন শোভন ভাবে শেষ হলো।

কুশল নম্রভাবে একটু হাসলো। কথা সে খুব কম বলে, শুধু আস্তে আস্তে বললো—অনুষ্ঠানটা তার নিজস্ব বিষয়-গৌরবেই উত্‌রে গেছে এর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের কোন কৃতিত্ব নেই।

কিছুদিন পরে কুশলের সঙ্গে অমিতার আরও একবার দেখা হয়েছিল, সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্মেলনে কুশল অমিতাকে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিল। এখানে অনেক লোকের ভিড়. প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে কুশলকে অনেক লোকের আপ্যায়নের ভার নিতে হয়। বহু কাজের মধ্যে একবার সে অমিতার কাছে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছিল—আপনি যে এসেছেন এতে আমি ভারি খুশী হয়েছি, অনেক দিন পরে দেখা হল। আশা করি পরীক্ষা ভালই দিয়েছেন।

কুশল কর্মব্যস্ত লোক। অতীতের কোন ঘটনাকে স্মৃতিতে

ধরে রাখবার যেমন তার কোন প্রয়াস নেই, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিয়েও সে তেমনি মাথা ঘামায় না, তার কাছে একমাত্র বর্তমানই সত্য। সেই প্রত্যক্ষ বর্তমানের পাওনাটা সে পুরোপুরিই শোধ করে, সেখানে কোন ফাঁকি নেই, অতীত হলেই সেটা ভুলে যায়।

অমিতার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, অমিতা নিজে এসে তার অনুষ্ঠানের কাজে সাহায্য করবার জন্যে ওকে ডেকে নিয়েছিল এ সব কথা স্মরণে রাখবার কোন প্রয়োজন আছে তা সে মনে করেনি, প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু কুশলের মা জাহ্নবীদেবী অনেকদিন-আগে-দেখা সেই মেয়েটিব কথা ভুলতে পারেননি, মাঝে মাঝেই ওকে তাঁর মনে পড়ে। কি চমৎকার মেয়ে, যেমন দেখতে তেমনি নম্র ব্যবহার, কুশলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল, আজকাল সাধারণতঃ যা দেখা যায় না, হাত তুলে নমস্কার করাটাই প্রথা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে থেকে মেয়েটিকে দেখে আর তার মিষ্টি কথাগুলো শুনে মেয়েটিকে তাঁর ভালো লেগেছিল। সেদিন কুশলের কাছে ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে কুশল মার মনোগত ইচ্ছাটাকে ধরে ফেলেছিল। তখন কিছু বলেনি, তারপর একদিন মা আবার যখন মেয়েটির কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসায় মুখর হলেন, কুশল হাসতে হাসতে বলেছিল—ওদিকে লোভের দৃষ্টি দিও না মা, ডক্টর রায়ের মেয়ের বিয়ে অনেক দিন থেকে পাকা হয়ে আছে।

মা ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তুই কি করে জানলি? আন্দাজে বলছিস্ বুঝি?

কুশল হো হো করে হাসে, বলে—আন্দাজে কথা বলবার ছেলে তোমার নয় তা তুমি বেশ জানো। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছি আর তা ছাড়া ওঁর যার সঙ্গে বাগ্‌দান হয়ে আছে তাকে আমি নিজেই দেখেছি।

মা ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে যান, আর কখনও ও কথা উল্লেখ করেন নি। ছেলে তাঁর বিয়ে করতে চায় না এ তাঁর বড় দুঃখ কিন্তু ওর

উপযুক্ত মেয়েও তো তিনি খুঁজে পান না। ওযে কথায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, ওর মনের ভাষা যে বুঝবে তেমন মেয়ে কি মেলে ?

॥ এগার ॥

সাধারণ কথা নিয়ে যে-টুকু মতান্তর হয় তা অনেক সময় মেনে নিলেও ভাবি স্বামীর খাতিরে নিজস্ব মতামতকে বিসর্জন দেওয়া অমিতার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না, তবু অনিন্দ্যকে দুঃখ দিতে তার খারাপ লাগে।

সেদিন অনিন্দ্য বলছিল—তুমি যাই বল অমিতা, আমি মনে করি বিদেশে—ইউরোপে না গেলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের এ দেশটা ভাল্‌গারিজম্‌ আর প্রেজুডিস্‌-এ ভরা, ও-দেশে গেলে অন্ধদের চোখ ফোটে। আমরা যে ওদের তুলনায় কত ছোট, কত অজ্ঞ তা ওখানে না গেলে বোঝা যায় না।

মুখ নীচু করে অমিতা মিটি মিটি হাসছিল, কোন উত্তর দেয়নি।

অনিন্দ্য আবার বলে—তুমি আমার কথা স্বীকার করছ না বোধহয় ?

অমিতা সংক্ষেপে উত্তর দেয়—না।

অনিন্দ্য বলে—কেন, যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

অমিতা এবার মুখ তোলে—কুসংস্কার কোন্‌ দেশে নেই ?

অনিন্দ্য থতমত খেয়ে বলে—না, তা বটে, তাও তো, তাও তো—

—তাও তো ওদেশের জিনিস, ও দেশটা যেমন মাজা ঘষা চকচকে ওদের কুসংস্কারটা বোধহয় তাই ?

খিল খিল করে হেসে উঠলো অমিতা ; তারপর বললো—এ তর্ক এখন থাক, চলো টেনিস খেলা যাক্‌, আমার বন্ধুরা এখখুনি এসে পড়বে।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর মনটা ভারি হালকা ছিল তাই সেদিন অনিন্দ্য যখন নিউ মার্কেটে যাবার প্রস্তাব করলো অমিতা আপত্তি করে বসলো—না, লোকের ভিড়ে নয়, চল ডায়মণ্ড হারবারের দিকে অনেক দূরে বেড়িয়ে আসি। মন আমার আজ দূরে পাল্লা দিতে চাইছে, শীতের সকালটা ভারি ভালো লাগছে। দেখো কি চমৎকার রোদ, যেন সোনা ঝরছে।

অনিন্দ্য ইন্‌জিনিয়ার মানুষ, লোহা লক্কড়ের মত শক্ত জিনিস নিয়ে তার কারবার, ভাবের আকাশে ওড়া তার অভ্যেস নেই, রুচিও নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেই সে অমিতার মতে মত দিল।

গঙ্গার ধারের প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে অনেক দূর গিয়ে একটা সবুজ মাঠের ধারে গাড়ী থামিয়ে ওরা নামলো। মাঠ, শস্যের খেত, গাছ-পালায় ঘেরা ছোট গ্রাম। অমিতার ভারি ভালো লাগছিল। ঘাসের শিশিরে পা ভিজে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ তার স্পর্শ, নিঃশব্দে সে হাঁটছিল। খানিকক্ষণ পরে অনিন্দ্য জিজ্ঞাসা করলো—আর কত দূরে যাবে ?

অমিতার মন বললো—অনিন্দ্য যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে প্রশ্ন করতো, "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী !'—নাঃ অতটা ভাবুকতা ওর কাছ থেকে আশা করা যায় না। বললো—চল না ঐ গ্রামের মধ্যে যাই।

অনিন্দ্য বললো—ওখানে গিয়ে কি লাভ ? কতকগুলো গ্রাম্য-অভব্য বেশভূষা আমার চোখে খুব খারাপ লাগে।

অমিতা হেসে বলে—কিন্তু নগরের প্রাণকেন্দ্র ঐ গ্রামই, ঐ অভব্য লোকগুলোই আমাদের অন্ন যোগায়। যাক্ গে সে কথা। কি লাভ ওখানে গিয়ে তাই জিজ্ঞাসা করছিলে ? সব সময় কি মন লাভক্ষতির হিসেব খতিয়ে চলতে চায়, ভালো লাগা বলেও তো একটা জিনিস আছে। মনে কর অকারণেই যাচ্ছি।

অনিন্দ্য বিরস মুখে বললো—বিনে কাজে মাঠে-ঘাটে ঘুরে

বেড়ানো আমার ভালো লাগে না। এর চেয়ে নিউ মার্কেটে গেলে কাজ হত, আমার টাই কেনবার দরকার ছিল।

অমিতা থম্‌কে দাঁড়ালো, তারপর বললো—তবে চল ফিরে যাই। ওর মুখের হাসি নিঃশেষে মুছে গেছে।

অনিন্দ্য তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়েছে, মাঠ পেরিয়ে সে রাস্তার দিকে এগোতে লাগলো। অতি ব্যস্ততায় তার মনে রইলো না যে, অমিতা ঠিক তার সঙ্গে চলার সমতা রক্ষা করতে পারছে না। দুজনে রাস্তায় যখন উঠে এল তখন তাড়াতাড়ি হাঁটার পরিশ্রমে এই শীতের সকালেও অমিতার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। অনিন্দ্য বললে—তোমরা এ দেশের মেয়েরা এমন অকর্মণ্য যে, একটু জোরে হাঁটতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ো আর দেখো তো ও-দেশের মেয়েরা কেমন কল কারখানায়—

অমিতা বাধা দিয়ে বললো—মেয়ে শ্রমিক এ-দেশেও আছে কিন্তু আমি শ্রমিক নই। এই বলে সে গাড়ীতে উঠে বসে বললো —এসো।

ধরিত্রী দেবী ডঃ রায়কে বিয়ের দিন স্থির করবার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। মেয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে আর মেলামেশাও করছে ওরা খুব, এবার অনিন্দ্যর বাড়ীতে চিঠি পত্র লিখে সব ঠিক করে ফেলা উচিত।—আমি বলি তুমি নিজেই গিয়ে অনিন্দ্যর বাবার সঙ্গে দেখা করো।

ডঃ রায় খুব উৎসাহ পান না, আস্তে আস্তে বলেন—আর কিছুদিন যাক্‌।

—পাগল হয়েছ নাকি? অনিন্দ্য এক বছর হল দেশে ফিরেছে, এবার দুর্গাপুরে চাকুরীও পেয়ে গেছে, মেয়ের পরীক্ষার অপেক্ষায় থেমে ছিল। পরীক্ষা হয়ে গেছে আর দেরি করা কি ভালো দেখায়? লোকেই বা কি বলে?

তবু যেন ডঃ রায় খুব জোর পান না, বলেন—মেয়ের মতামত নিতে হবে না ?

ধরিত্রী দেবী যেন আকাশ থেকে পড়েন, আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি বলছো কি !

—ঠিকই বলছি। অনিন্দ্য যখন জার্মানিতে যায় আমার মেয়ের তখন বয়স কম ছিল ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। তখন আমরা যেটা ঠিক করেছিলাম ওর আজকের পরিণত মনও ঠিক তাই চায় কিনা সেটা বুঝতে ওকে সময় দিতে হবে।

ধরিত্রী দেবী স্তম্ভিত হয়ে যান। একটু পরে বলেন—সমাজকে ভয় করো না তুমি ? লোকের কথাকে ?

ডঃ রায় জবাব দেন—না। সমাজের চেয়ে বড় আমার মেয়ের জীবন, তার সুখ। আমার কেমন মনে হয় ওর রুচির সঙ্গে অনিন্দ্য নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না।

—কিযে বল তুমি তার ঠিক নেই ! ও বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে, একটু আবদার অভিমান করে হয়তো, আমার সেটা ভালোই লাগে। আমার তো ছেলে নেই ওকে ছেলের মতই মনে হয়, ওর আবদার যদি আমরা না রাখি তবে কে রাখবে ?

—সেটা ঠিক, কিন্তু আমার মনের খট্‌কাটা কিছুতেই যাচ্ছে না। তাই বলছি অত তাড়াহুড়ো কোরো না ওদের দুজনের দুজনকে বুঝতে দাও।

ধরিত্রী দেবী নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে থাকেন।

॥ বারো ॥

অমিতার প্রসাধন শেষ হয়ে গিয়েছিল, ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই মা বললেন—বেবি, কোথায় বেরুচ্ছিস ?—বিস্মিত চোখ তুলে তিনি ওর দিকে চাইলেন।

কলেজের ছেলেমেয়েরা মিলে অভিনয় করবে স্থির হয়েছে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' প্লে হবে, শকুন্তলার পার্ট ছিল অমিতার। সে রিহার্সাল দিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। ক'দিন থেকেই যাচ্ছে, মা তা জানেন কিন্তু আজও ওযে বেরিয়ে যাবে তা আশা করেননি কারণ ও জানে অনিন্দ্যকে উনি আজ খেতে বলেছেন।

বিরক্ত হয়ে মা বললেন—আজ তোর যাওয়া হবে না। জানিস্‌ই তো অনিন্দ্যকে খেতে বলেছি, সে হয়তো সন্ধ্যে হতেই এসে পড়বে, তখন তোর বাড়ীতে না থাকাটা ঠিক হবে না।

—কিন্তু মা, আমার যাবার কথা আছে। আমি না গেলে ওরা মুশকিলে পড়বে। তুমিই তো আছ গল্প কোবো, আমি যত শীগগির পারি ফিরে আসবো। আটটার মধ্যেই ফিরতে পারব আশা করছি।

আরও বিরক্ত হয়ে ধরিত্রী দেবী বললেন—তোর সবতাতেই জেদ্, টেলিফোন করে ওদের জানিয়ে দে যে, তোর আজ যাবার উপায় নেই!

—ওরা যখন জিজ্ঞাসা করবে কেন যাচ্ছি না, তখন কি বলব মা?

মা বললেন—অত কৈফিয়ত দিতে হবে না, বাড়ীতে কি লোকের বিশেষ কোন কাজ থাকতে নেই? আজ তোর যাওয়া হবে না বলে দিচ্ছি।

অমিতা চুপ করে রইলো তারপর ক্ষুণ্ণ মনে গিয়ে টেলিফোন ধরলো, বন্ধুদের জানিয়ে দিল সে আজ যেতে পারছে না, কারণ অনিবার্য। 'তার অংশটা আজকের মত কেউ যেন চালিয়ে নেয়।

রিহার্সাল দিতে যেতে না পেরে অমিতার মনটা ক্ষুব্ধ হয়েছিল কিন্তু অনিন্দ্য এলে তাব ভালোই লাগলো। মনে হল জেনে শুনে আজ বেরিয়ে যাওয়াটা ওর ওপর অন্যায় করা হত, সে তো তার সঙ্গ পাবার জন্যেই এখানে আসে। একটা করুণ স্নেহে ওর মন ভরে যায়। আজ সন্ধ্যায় ওকে এড়িয়ে যাবার যে পলায়নী মনোবৃত্তি তার মধ্যে ক্রিয়া করেছিল তাতে লজ্জা ছিল, ফাঁকির লজ্জা, কপটতার

লজ্জা। নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো, কেন, সে নিজেও কি ওর সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল নয়? অনিন্দ্যকে, একমাত্র অনিন্দ্যকেই কি সে তার সমস্ত হৃদয়ের আকুলতা দিতে চায় না?

সাগরের ওপারে অনিন্দ্য যখন পড়াশোনা করেছে তার উন্মুখ যৌবনে দেখা তরুণ অনিন্দ্যের মূর্তিকেই সে মনের গহনে ভালবাসা দিয়ে লালন করেনি? তার চিঠির জন্যে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছে আবেগ উচ্ছ্বাস তাতে না থাকলেও চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছে। জেনেছে তাদের দুজনের ভাবী জীবনকে সুন্দর করবার জন্যেই একান্ত হয়ে কঠিন শ্রমে সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। অনিন্দ্যর মধ্যে তো এক ফোঁটা ফাঁকি ছিল না, অনিন্দ্যকে যদি সে ভালবাসতে না পারে তবে সেটা তার মানসিক অক্ষমতা, তার অপরাধ। না, না, অনিন্দ্যকে সে ভালবাসে, না-ভালবাসবার তো কোন কারণ নেই। পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার সংঘাতকে অস্বীকার করে যুক্তিধর্মী মন তার নিজেকে যুক্তির ওপর দৃঢ় করে প্রতিষ্ঠিত করে।

আজ খাবার টেবিলে অমিতাকে এতটা উচ্ছ্বসিত দেখা গেল যা ওর পক্ষে খুব স্বাভাবিক নয়, ডঃ রায় এটা লক্ষ্য করে মনে ভাবলেন ওদেব মিলন বিলম্বিত করে তিনি কি ভুল করেছেন? মিলিত জীবনে হয়তো ওরা সুখীই হবে, দ্বিধা করা বোধহয় আর তাঁর উচিত নয়। বিয়ের দিন স্থির করবার জন্যে মনকে তিনি প্রস্তুত করলেন।

অমিতা অনিন্দ্যকে একখানা কার্ড দিয়ে বললো—তোমায় কিন্তু আমাদের প্লে দেখতে যেতেই হবে।

অনিন্দ্য কার্ডখানা উল্টে পাল্টে দেখে নিস্পৃহস্বরে বলে—আমার ওসবে বিশেষ উৎসাহ নেই, আমি না গেলে হয় না? নাচ গান প্লে এই সব অকেজো ব্যাপার নিয়ে লোকে কেন যে এত মাতামাতি করে আমি বুঝতেই পারিনে।

অমিতা হাসতে হাসতে বলে—এই সব নিয়ে যারা মাতামাতি

করে জগতে তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। এদের সবাইকে তো আর নির্বোধ বলতে পারিনে, বিশেষ করে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথও যখন এদের দলে আছেন। কিন্তু দেখো, যারা এর মধ্যে কিছুই খুঁজে পায় না সত্যি তাদের অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু করা যায় না।

অমিতা খিল খিল করে হেসে উঠলো তারপর বললো—আচ্ছা, বেঠোফেনের বাজনা শুনেছো? মোৎসার্টের?

অনিন্দ্য ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল, উষ্ণ হয়ে বললো—আমি সত্যি ওসবে কিছু খুঁজে পাইনে, লঘুচিত্ততা আমার দু-চোখের বিষ। মানুষ কাজের কাজ ছেড়ে কেবল নেচে গেয়ে বেড়াবে তাহলে সংসার চলে কি করে? তার চেয়ে বিজ্ঞানচর্চা করো, সমাজ কল্যাণেব কাজে হাত দাও, দেশের উন্নতি হবে। আমার মতে এগুলো নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

—তাহলে সংসারে পাগলের সংখ্যাই বোধহয় বেশী, এই পাগলামী না থাকলে মানুষ মেসিনে পরিণত হতো, শুধু কাজ নিয়ে বোধহয় বাঁচতে পারতো না।

অনিন্দ্য আরও উত্তেজিত হয়ে বললো—তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মোটেই মিল খায় না। তুমি যে অভিনয় করে বেড়াও এটাও আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

অমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল, কিন্তু ভেতরের উত্তাপকে বাইরে সে প্রকাশ পেতে দিল না মোটেই, আস্তে আস্তে উত্তর দিল—কিন্তু আমারও তো একটা স্বাধীন সত্বা আছে।

দিনের পর দিন কেমন একটা মানসিক ক্লান্তি যেন অমিতার মনকে আচ্ছন্ন করছিল, কিসের এ ক্লান্তি তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মনে ভাবে শরীরটা বোধহয় ভালো নেই, পরীক্ষার সময় খুব খাটুনী গেছে। বিয়ের পরে কোথাও বেড়াতে যাবে, পাহাড়ে নয়তো সমুদ্রের ধারে, দিনগুলো কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে, বৈচিত্র্য এলে বোধহয় ভালো লাগবে।

এক একবার অস্পষ্ট সন্দেহ মনে ছায়া ফেলে, অনিন্দ্যের সঙ্গে মতের সংঘর্ষে কি সে ক্লান্ত হচ্ছে? না, না, ছিঃ, ও কথা কেন সে ভাবে? ওর তো কোন দোষ নেই কেবল কাজ ভালবাসে বলে ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দিতে ওর আপত্তি, পুরুষ মানুষ তো এমনি দৃঢ় হওয়াই ভালো। সব সময় মনের বিরুদ্ধে তর্ক করে ও নিজের মনকে হার মানাবার চেষ্টা করে, আবেগ প্রবণতা ভালো নয়, শক্ত মানুষের হাতে সে শক্ত হয়েই গড়ে উঠতে চায়।

বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে, আয়োজনও চলছে। ধরিত্রী দেবী মহা উৎসাহে মেয়ের শাড়ী গয়নার ফর্দ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অমিতাকে ওর পছন্দ জিজ্ঞাসা করলে ও বলে—তোমার যা ভালো লাগে তাই কর মা, আমি ওসব বুঝিনে।

মা হাসতে হাসতে বলেন—তোর জিনিস তুই বুঝবিনে তো কে বুঝবে?

মনের সঙ্গে শরীরেও যেন ক্লান্তি ছেয়ে যায়। রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে সমস্ত শরীরে একটা স্নায়বিক যন্ত্রণা হতে থাকে, দম বন্ধ হয়ে আসে। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে সে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ লেগে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দিনের বেলা এর এতটুকু বাষ্পও সে প্রকাশ পেতে দেয় না, মুখে তার হাসি লেগেই থাকে তবু ডঃ রায়ের মনে হয় ঝর্ণার কলধ্বনির মত যে-উচ্ছল হাসি ও চারদিকে ছড়িয়ে দিত সে-হাসির আওয়াজ বুঝি আর শোনা যায় না।

অমিতাকে আশীর্বাদ করতে বরপক্ষ আসছেন, তাঁদের আদর আপ্যায়নের আয়োজনে ধরিত্রী দেবী ব্যতিব্যস্ত, ডঃ রায় উদ্‌বিগ্ন। যথাসময়ে তাঁরা এলেন, কন্যাপক্ষের সঙ্গে যথারীতি শিষ্ট আলাপের পর তাঁরা কন্যাকে আশীর্বাদ করতে চাইলেন। ডঃ রায় ভেতরে

গিয়ে অমিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, সে সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বরের পিতা দুগাছি সোনার বালা হাতে নিয়ে বললেন—দেখি মা লক্ষ্মী, তোমার হাত দুখানি, আমার কাছে এসে বোসো তো।

অমিতা যেন শক্ত কাঠ হয়ে গেল, ডঃ রায় তার অশক্ত হাত দুখানি একটু তুলে ধরতেই আশীর্বাদী বালা দুগাছি ওর হাতে পরিয়ে দিয়ে বরের পিতা ওর মাথায় ধানদূর্বা রাখলেন, ভেতর থেকে শাখ বেজে উঠলো।

অমিতার আজও তেমনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, শরীরে সেই স্নায়বিক যন্ত্রণা। আশীর্বাদের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে অনুমতি পেয়ে উঠে যাবার সময় যেই সে দরজার বাইরে পা বাড়িয়েছে আকস্মিক ভাবে মাথা ঘুরে ওখানেই পড়ে গেল। অন্তরালের মেয়েদের মধ্যে একটা গুঞ্জনের শব্দ উঠলো, ডঃ রায় ছুটে গেলেন, দুহাতের ওপর ওকে তুলে নিয়ে তিনি বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

দিনের পর দিন যে মানসিক দ্বন্দ্ব অলক্ষ্যে অমিতার মনোবলকে ক্ষয় করে আনছিল এই ঘটনায় সেটা বাহিরে প্রকাশ পেতে দেখা গেল। হঠাৎ এই রকম একটা কাণ্ড ঘটাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয় দিকেই একটা সন্দেহের ছায়াপাত হল।

বিছানায় শুয়ে চোখ বুজেই অমিতা আস্তে আস্তে হাতের বালা খুলে বিছানার পাশে রাখছিল, মা এসে ওর হাত ধরে বললেন—ও আজ খুলতে নেই বেবি।

অমিতার ঠোঁটের উপর একটা ক্লান্ত সকরুণ হাসি ফুটে উঠলো, ধীরে ধীরে ও পাশ ফিরে শুলো।

॥ তের ॥

হ্যালো শুভেন্দু!

দারজিলিং-এ ম্যালের রাস্তায় শুভেন্দু ও সুরঙ্গমা দুজনে হাঁটছিল হঠাৎ পিঠের ওপর এক প্রচণ্ড চাপড় খেয়ে শুভেন্দু ফিরে দাঁড়ালো, পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত খুশীতে বলে উঠলো—আরে এযে হারীত, তুমি কোথা থেকে? বহুদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই! এসো, এসো তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি', ইনি আমার স্ত্রী সুরঙ্গমা সেন আর ইনি হচ্চেন আমার কলেজের বন্ধু হারীত মুখার্জি।

হারীত আর সুরঙ্গমা দুজনে দুজনকে নমস্কার করলো, কিন্তু হঠাৎ সুরঙ্গমার মুখখানা যেন ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে গেল। যেন কোনো এক ভয়ঙ্করকে চোখের সামনে দেখে বুকের ভেতরটা তার বরফের মত হিম হয়ে এল।

হারীত বললো—অভাগাকে কৃপা করে দু-একটা মধুর বাণী শুনিয়ে দিন বৌদি, মুখ ফিরিয়ে রইলেন কেন?

প্রাণপণে সহজ হবার চেষ্টা করে সুরঙ্গমা উত্তর দিলো—না, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

শুভেন্দু ব্যস্ত হয়ে উঠলো—শরীর আবার কখন থেকে খারাপ হল? চল তাহলে বাড়ী ফেরা যাক। ওহে হারীত, করছ কি এখন? সেই যে লক্ষ্ণৌ কলেজে বি-এস্‌সি পড়তে পড়তে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তারপর কোথায় গেলে কি করলে কিছু জানি না। আচ্ছা এসো একদিন আমার ওখানে হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে থাকি। আসছো তো? ভুলো না যেন।

—নিশ্চয়ই, হঠাৎ যখন তোমাদের দেখা পেয়ে গেছি তখন বৌদির হাতের চা না খেয়ে কি ছাড়ছি? আচ্ছা ভাই চলি।

হাসতে হাসতে হারীত চলে গেল, শুভেন্দু সুরঙ্গমাকে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলো।

পথে সুরঙ্গমা শুভেন্দুকে বললো—ওকে আবার বাড়ীতে ডাকতে গেলে কেন? লোকটাকে আমার একটুও ভালো লাগলো না।

শুভেন্দু হেসে উত্তর দেয়—তুমি তো ওকে চেনো না, ভারি স্ফূর্তিবাজ লোক, হৈ হুল্লোড় করায় ওস্তাদ। কলেজে পড়াশোনা না করে ইউনিয়ন গড়তো, লীডারশিপ নিতো, মার খেয়ে গেল, ফেল করলো। সেই যে কলেজ ছাড়লো তারপর কোথায় গেল কিছু জানিনে।

সুরঙ্গমা চুপ করে রইলো। সে জানে তার পরেকার ওর ইতিবৃত্ত। কলকাতায় এসে তাদের বাড়ীর কাছে বাসা নিয়েছিল ওর বিধবা মাকে নিয়ে। সুরঙ্গমা তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। জানলার সামনে টেবিলে বসে পড়াশোনা করে, মাঝখানকার সরু গলির ওপারে সামনের বাড়ীর ছেলেটা প্রায়ই ওদিকে জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়, ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বিরক্ত হয়ে পড়ার টেবিলটা ও ঘরের অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েছিল। তাতেও শান্তি নেই, নির্জন পড়ার ঘরে ও-বাড়ীর জানলা থেকে কাগজের মোড়ক এ-ঘরে এসে পড়ে। প্রথম প্রথম ও ভয় পেয়েছিল, সেগুলো না খুলেই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। তারপর একদিন কৌতূহল হল কি লেখে দেখাই যাক না।—রূপের স্তুতি। তার মন ভ্রমর ওর মুখপদ্মের মধুর আশায় দিন গুনছে।

গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। সুরঙ্গমার মার্জিত মন ঘৃণায় কুঁকড়ে গেল, ওদিককার জানলাটা দিল বন্ধ করে। বাড়ীতে কৈফিয়ত দিল দুই বাড়ীর মাঝের সরু গলিটায় ছেলেরা চেঁচামেচি করে, পড়ার অসুবিধে হয়। কম বয়সের ভীরুতায় ভুল করলো, আসল কথা কারুকে বলতে সাহস করলো না। বাবা মা বেঁচে নেই, তখনও সঞ্জয় বিয়ে করেনি, বাড়ীতে সুরঙ্গমার অভিভাবিকা এক বৃদ্ধা পিসিমা।

একদিন দুপুর বেলা কলেজ থেকে ফিরে দেখে ছেলেটি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ভূত দেখে যেন চমকে উঠলো সুরঙ্গমা, তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যাচ্ছিল পেছনে আঁচলে টান পড়লো, চেঁচিয়ে উঠলো সে। চাকররা ছুটে এল, ততক্ষণে হারীত সরে পড়েছে।

এর পরে কলেজের পথে হারীতের আবির্ভাব তাকে বিব্রত করতে লাগলো। বাড়ীর কাছে কলেজ তাই হেঁটেই কলেজে যেত কিন্তু ক্রমেই সেটা অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাছাকাছি এসে ওকে নাম ধরে ডাকে, দু-একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় গা ঘেঁষে পাশ দিয়ে চলে যায়, রাগে সুরঙ্গমার কান্না পেতে থাকে। রাস্তার মাঝখানে চেঁচিয়ে ওঠা যায় না তাহলে কেলেঙ্কারী হয়। অসহ্য হয়ে উঠেছে, দাদাকে না বললে আর চলে না। আবার সেই ভয়, দাদার কাছে সে তো মিথ্যে বলতে পারবে না, শুরু থেকেই বলতে হবে। যদি সে জিজ্ঞাসা করে, এতদিন বলিস নি কেন? এই গোপনতার অপরাধে যদি সে ওকেই অবিশ্বাস করে বসে! এই উভয় সঙ্কটে সুরঙ্গমার প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল। একদিন নির্জন অবসরে ও মরিয়া হয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের জানলায় ছেলেটাকে দেখা গেল, সে হেসে বললো—এতদিনে সুমতি হয়েছে?

উগ্রকণ্ঠে সুরঙ্গমা চেঁচিয়ে উঠলো—কি চান আপনি? এমন করে আমার পেছনে লেগেছেন কেন? পুলিস কেস্ করবো জানেন?

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললো—তাহলে এতদিন করোনি কেন? দরকার কি অত ঝামেলায় কলেজ থেকে ফিরে একদিন সন্ধ্যেবেলা পার্কে এসো না, গল্প করা যাবে।

রাগে দিশেহারা হয়ে সুরঙ্গমা চিৎকার করে উঠলো—ইতর ছোটলোক, লোফার কোথাকার, জেলখানাই আপনার উপযুক্ত জায়গা, ভদ্রসমাজে নয়। আর এই হচ্ছে আপনার কথার উপযুক্ত

জবাব। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুরঙ্গমা তার মত কোমল-চিত্ত মেয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক এক কাজ করে বসলো, ক্ষিপ্রহাতে পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে নিয়ে হারীতের জানলার দিকে ছুঁড়ে মারলো। পরক্ষণেই প্রচণ্ড আক্রোশের সঙ্গে দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমার কান্না পায়, এই অপমানকে হজম করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পায় না। আজ যদি তার মা থাকতেন তবে তাঁকে সব খুলে বললে তিনি সব বুঝতে পারতেন আর এর প্রতিকার করতে পারতেন। দাদাকে প্রথমটায় বলেনি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাকে উদ্‌বিগ্ন করতে চায়নি বলে, ভেবেছিল পড়ার টেবিলখানা সরিয়ে নিলেই সব মিটে যাবে। ক্রমে ব্যাপার যখন গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো তখন প্রথম থেকে গোপন করার অপরাধ তাকে বাধা দিতে লাগলো। ভয় পেলো, দাদা পাছে ভাবে মেয়েটা জানলায় দাঁড়িয়ে ইয়ারকি করছিল এখন সামলাতে না পেরে তার কাছে প্রকাশ করেছে। উঃ তাহলে মরে যাবে সে, তার সংস্কৃতি পরিচ্ছন্ন মন নিরুপায় ক্ষোভে গুম্‌রে ওঠে। একবার ভেবেছিল কলেজে যাওয়া বন্ধ করবে কিন্তু তাও কি সম্ভব? দাদাকে কি কারণ দেখাবে? অনেক ভেবে অবশেষে এক পথ আবিষ্কার করলো, স্থির করলো ভিক্‌টোরিয়া কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে ভর্তি হবে। বাড়ীর কাছাকাছি বলে এখানে পায়ে হেঁটে কলেজে যেতো, দাদাকে বলে এবার স্কটিশ চার্চ-এ ভর্তি হবে।

সঞ্জয় হাসতে হাসতে বললো, তুই মেয়েটার মতিস্থির নেই। আমি তো আগেই বলেছিলাম ওখানে ভর্তি হবার কথা, ছেলেদের সঙ্গে কম্পিটিশানে জিততে হলে খাটতে হবে এই ভয়েই না পেছিয়ে এলি?

সুরঙ্গমা নিঃশব্দে একটু হাসে।

এর পরে স্কটিশ চার্চ এ ভর্তি হয়ে বাড়ীর গাড়ীতে কলেজে যায়,

গাড়ীতে আসে। পাশের বাড়ীর দিককার জানলাটা সেই যে বন্ধ করেছিল আর খোলেনি।

এর পরে সুরঙ্গমার জীবনে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। বিরল অবসরে যখন মনে পড়ে দারুণ দুঃস্বপ্নের মত সে-স্মৃতি আজও তাকে ভয় দেখায়। সেই ঘটনার পরেই হারীত পাশের বাড়ী ছেড়ে যেন কোথায় চলে যায় তারপব সুবঙ্গমা আর তাকে দেখেনি।

॥ চৌদ্দ ॥

অনেকদিন পরে হারীতকে দেখে সুরঙ্গমার আতঙ্কে প্রাণ কেঁপে উঠলো। তাদের আনন্দ-নন্দনে এ দানবেব আবির্ভাব কেন হল, যদি আগেকার কথাগুলো প্রকাশ পেয়ে যায়? ও নিজে তো নিজের অন্যায় গোপনই করবে কিন্তু তার সম্বন্ধে যদি শুভেন্দুকে কিছু বলে? তার ওপর আক্রোশ আছে তো। দারুণ ভয়ে সুরঙ্গমা আড়ষ্ট হয়ে রইলো।

শুভেন্দু সকালবেলা হাসপাতালে যায়, দুপুর বেলা বাড়ীতে ফিরে বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করে। হাসপাতালের কোয়ার্টার্সগুলো প্রায় হাসপাতালের সংলগ্ন। শুভেন্দু বেরিয়ে গেলে সুরঙ্গমা স্বামীর জন্যে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কবে দিয়ে স্নান সেরে নেয় তারপর কোন একখানা বই হাতে নিয়ে শুভেন্দুব প্রতীক্ষায় ড্রয়িংরুম-এ এসে বসে। রোজকার মত আজও এসে বসেছিল। হঠাৎ কানে এল—কি বৌদি, একলা দেখছি, শুভেন্দু হাসপাতালে গেছে বুঝি?

ভয়ানক চমকে উঠে মুখ তুলে হারীতকে দেখে ও সন্ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললো—বসুন, উনি একটু পরেই এসে পড়বেন।

ঘর থেকে ও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছিল, হারীত বললো—বাঃ দারজিলিংয়ের আবহাওয়ায় তো ভারি সুন্দর হয়েছ দেখছি,

গালদুটো আপেলের মত গোলাপী হয়ে উঠেছে! চলে যাচ্ছ কেন, অতিথি আপ্যায়নের রীতি তো এ-রকম নয়? হারীত ভালো করে সোফায় বসলো। হারীতের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে সুরঙ্গমা লজ্জায় অপমানে আরও রাঙা হয়ে উঠেছিল, উত্তেজিত চাপা স্বরে বললো—আপনার সঙ্গে তো আমার কোনদিন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, আমাকে তুমি বলছেন কোন্ অধিকারে?

—ভালবাসার অধিকারে সুরঙ্গমা, যে অধিকার একদিন তুমিই আমাকে দিয়েছিলে। ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না সে কথা তুমি নিজেই মনে মনে জানো। যখন শুভেন্দু বাড়ীতে থাকবে না আমি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসবো, তুমি আমায় বিমুখ কোরো না সুরঙ্গমা।

রাগে জ্ঞান হারা হয়ে সুরঙ্গমা তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—ভদ্র-মহিলার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে জানেন না? উঠে যান্, বেরিয়ে যান্ বলছি।

—সুরঙ্গমা, এমন করে আমায় বিদায় কোরো না, তোমার জন্যে আমার জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে, তুমি নিষ্ঠুর হয়ে এমন করে আমায় ফিরিয়ে দিলে আমি মরে যাব সুরঙ্গমা।

হারীত হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, সুরঙ্গমার হাত দুখানি ধরে আকর্ষণ করে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকের ওপর চেপে ধরলো তারপর তার মুখচোখ বুক অজস্র চুমোতে ভরিয়ে দিতে লাগলো। পাগলের মত এই উদ্দামতা সুরঙ্গমার সমস্ত স্নায়ুকে অবশ করে এনেছিল, অচেতনের মত তার মাথাটা হারীতের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

হারীত উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে—তুমি আমার, তুমি আমার সুরঙ্গমা, একদিন তুমি আমায় ডেকেছিলে, আজ অনেক দিন পরে তোমায় কাছে পেয়েছি, তুমি আমারই আর কারো নয়, তুমি—

কথা শেষ হল না, দরজার সামনে শুভেন্দুকে দেখা গেল। একটুক্ষণ আগেই সে এসেছিল, হারীতের কথাগুলো কানে যেতেই

সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কয়েক মুহূর্ত তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, তারপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে ঘরে ঢুকলো।

চট্ করে সুরঙ্গমাকে ছেড়ে দিয়ে হারীত ফিরে দাঁড়ালো, কাষ্ঠ হাসি হেসে বললো—এই যে শুভেন্দু, এসেছ, দেখো তো কি বিপদ! আমি আবার হস্তরেখা বিচারের চর্চা করি কিনা, বৌদিকে বলছিলাম আপনি খুব ভাগ্যবতী, আপনার হাতখানা একটু দেখব। কিন্তু হাত দেখতে দেখতে কেন জানি না বৌদির মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো, তাই ওঁকে ধরে সোফায় শুইয়ে দিচ্ছিলাম, যাক্ তুমিই এসে পড়েছো আব ভাবনা নেই।

শুভেন্দু কোন উত্তর দিল না, সব কথা তার কানেও যায়নি, পর্দা ঠেলে সে সোজা ভেতরেব ঘরে চলে গেল। টল্‌তে টল্‌তে সুবঙ্গমাও তার পেছনে ভেতরে গিয়ে ঢকলো।

রাত অনেক। ঘড়ির কাঁটা অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ করে চলেছে। বিছানায় সুরঙ্গমার সঙ্গে অনেকখানি দূবত্ব রেখে শুভেন্দু একপ্রান্তে শুয়ে আছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শুভেন্দু গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলো—কতদিনের পরিচয়? আগেকার ভালবাসা বুঝি?

সুরঙ্গমা উত্তর দেয় না। আতঙ্কে তার মুখ কালো হয়ে গেছে, চোখের পাতা বুজে গেছে, শুভেন্দুর দিকে চাইতে পারছে না। ভীরু পাখীর ছানার মত দুর্বল বুক জোরে জোরে ওঠা পড়া করে। আরও খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর শুভেন্দুই আবার কথা বলে—আচ্ছা ঘুমোও, আমাকে যেন ছুঁয়ো না, আজকের মত তো আর উপায় নেই কাল থেকে আমার বিছানা ও-ঘরে হবে।

পাশ ফিরে শুয়ে সে চোখ বুজলো। সুরঙ্গমার গলা যেন বুজে গেছে, কথা বলতে চেষ্টা করলো স্বর ফুটলো না, ক্রমে রাত আরও গভীর হয়ে এল। শুভেন্দু জেগে আছে তা সে বুঝতে পারছে, এবার

সুরঙ্গমা মরিয়া হয়ে উঠলো, কথা তাকে বলতেই হবে, শুভেন্দুকে জানাতে হবে, যে-ঘটনা আজ ঘটলো তাতে ওর কোন হাত ছিল না। না হলে সে শুভেন্দুর কাছে চিরদিনের মত অপরাধী হয়ে থাকবে। প্রাণপণ চেষ্টা করে সুরঙ্গমা বলে ফেললো—দেখো, আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি যা দেখেছো তাতে আমার কোন দোষ নেই, তোমার বন্ধুই আমাকে জোর করে—

শুভেন্দু থামিয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললো—থাক্ আমি শুনতে চাইনে, আমার অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, আমায় একটু চুপ করে থাকতে দাও দয়া করে।

কুণ্ঠিতভাবে সুরঙ্গমা বলে—একটু অডিকোলন মাথায় দিয়ে দি'।

শুভেন্দু কঠিন স্বরে জবাব দেয়—দরকার নেই।

বিনিদ্র দম্পতির কি ভাবে রাত কাটলো ওদের অসাড় বোধ-শক্তিতে তা ধরা পড়লো না।

সকাল বেলা শুভেন্দু যথারীতি চা ও খাবার খেয়ে হাসপাতালে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ; সে চা চাকরের হাতে তৈরী, সুরঙ্গমার হাতে নয়। শুভেন্দু পোশাক পরছিল সুরঙ্গমা কাছে এসে দাঁড়ালো। এক রাত্রে কিসে যেন সুরঙ্গমার মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে, পাণ্ডুর বিবর্ণ তার মুখ, পা দুখানা কাঁপছিল। শুভেন্দু তার দিকে ফিরেও চাইলো না। প্রতিদিন সুরঙ্গমাই শুভেন্দুর টাই বেঁধে দেয়—সে এক পা এগিয়ে আসতেই শুভেন্দু একটু সরে দাঁড়িয়ে বললো—থাক্ তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে না।—বলে নিজের হাতে সে টাইয়ের ফাঁসটা টেনে দিল।

সুরঙ্গমা যেন জড়বস্তুর মত অসাড় হয়ে গিয়েছিল, হাসপাতাল থেকে ফিরে শুভেন্দু যখন চাকরদের ডেকে আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে নিল ও তখন বাধা দেবার শক্তি পেল না।

রাত দুটো। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। আজ সারাদিন সুরঙ্গমা শুভেন্দুর সঙ্গে একটি কথাও বলেনি, বলতে পারেনি। একলা বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে করতে হঠাৎ সুরঙ্গমা উঠে বসলো, মনকে দৃঢ় করলো, ভাবলো সব কথা আজ খুলে বলবে। সে তো কোন অপরাধে অপরাধী নয়, তবে কেন এ শাস্তিকে, এ অপমানকে স্বীকার করে নেবে? কাল আকস্মিকতার ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে সে মুখ খুলতে পারেনি, আজ তাকে সব কথা বলতেই হবে।

উত্তেজনার মুহূর্তে খাট থেকে নেমে সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, শুভেন্দু জেগে ছিল তাড়াতাড়ি উঠে বসলো, বললো—তুমি আবার এখানে কেন? ওই চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বোসো, এ বিছানাটাকে আর অপবিত্র কোরো না।

অপমানে সুরঙ্গমার সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠলো, কান ঝা-ঝাঁ করছে, প্রাণপণে সে নিজেকে নিঃশব্দে সংবরণ করবার চেষ্টা করছিল। কয়েক মিনিট কাটলো; শুভেন্দু নিস্তব্ধ—সুরঙ্গমাই কথা বললো, কান্না ভাঙ্গা গলায় বললো—আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

শুভেন্দু নিঃশব্দে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুরঙ্গমা তখন তার কিশোর বয়সের ঘটনা, পাশের বাড়ীর ছেলের অত্যাচারের সব কাহিনী অশ্রুসিক্ত চোখে আগাগোড়া বলে যায়। নিশ্চল চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে সব শুনে শুভেন্দু বললো—কই কাল তো কিছু বলনি? এ কাহিনী যে তুমি সারারাত ভেবে নিজের অনুকূলে রচনা করনি তা কেমন করে বিশ্বাস করবো?

শুভেন্দুর পায়ের ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুরঙ্গমা বললো—বিশ্বাস করো, ওগো বিশ্বাস করো আমার প্রথম ভালবাসার জন তুমি, আর আজও তুমিই আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছ, আমায় ভুল বুঝো না।

দুহাতে ওর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল সুরঙ্গমা।

আস্তে আস্তে পা দুখানা মুক্ত করে নিয়ে শুভেন্দু বিছানার ওপরেই সরে বসলো। তিক্ত কণ্ঠে বললো—দুবছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে এ ব্যাপারটা এতদিন তো বেশ গোপন রেখেছিলে এখন নিতান্ত ধরা পড়েই প্রেমিকের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচতে চাও, না? সুবিধাবাদী মেয়েরা এ কৌশলটাকে বোধহয় বেশ ভাল করেই শেখে। প্রথম প্রেমকে ভুলতে না-পারা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, সেজন্যে তোমাকে আমি দোষ দেব না, আমার ভুলটা যে ভাঙ্গলো এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য।

অপমানের জ্বালায় সুরঙ্গমার সমস্ত দেহে যেন আগুন ধরে গেল. হঠাৎ খাট থেকে ছিটকে সরে এসে সে নেমে দাঁড়ালো—তুমি কি আমাকে অপমান করে তাড়াতে চাও?—মাথা তুলে শুভেন্দুর চোখে চোখ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সুরঙ্গমা।

—না, তাড়াতে চাইনে, সেটা আমার পক্ষে সামাজিক লজ্জা তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো, শুধু আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ রইলো না। বাইরের লোকে সেটা জানতে পারবে না, তারা সবই স্বাভাবিক চোখে দেখবে।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো সুরঙ্গমা, সে নিঃশ্বাস যেন আগুনের হল্কা। দাঁতে দাঁত চেপে একটা আর্ত-চিৎকারকে সে যেন ঠেকাচ্ছিল তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—তোমার কৃপার আশ্রয়কে আমি ঘৃণা করি। তোমার সামাজিক সম্মান অসম্মানের ধার আমি কেন ধারবো! যখন তুমি আমার কেউ নও, আমার যেখানে খুশি আমি চলে যাব। বন্ধনের এ চিহ্নকে তবে কেন আর স্বীকার করি? জীবন যখন চূরমার হয়ে গেল তখন এ-গুলোও দূর হয়ে যাক।

ক্ষিপ্তের মত হাতের চুড়িবালাগুলোকে সে ঘরময় ছুঁড়ে ফেললো, তারপর শ্বেত পাথরের ড্রেসিং টেবিলে হাত দুখানা আছড়ে ফেলে হাতের শাঁখা জোড়াকে চূর্ণ করলো। কাপড়ের খুঁট দিয়ে

সিঁথির সিঁদুর জোরে জোরে রগ্‌ড়ে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরক্ত মুখে সে হাঁফাতে লাগলো।

শুভেন্দু স্তব্ধ হয়ে সব দেখলো, একটি কথাও উচ্চারণ করলো না। সুরঙ্গমাও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে এবার তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। আস্তে আস্তে বললো—তোমার শেষ কথা তো হয়ে গেল?

শুভেন্দু যেন অনেকক্ষণ ধরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ একটু চম্‌কে উঠলো, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—হিন্দুর মেয়ের চিরন্তন সংস্কারকে এমন করে দুপায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ফেলাও যে সম্ভব কোন মেয়ের পক্ষে তা চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না। বুঝতে পারছি নৈতিক চরিত্রের সংস্কারও তোমার কাছে এই রকমই একটা ঠুনকো জিনিস ছিল।

একটু থেমে বালিসের নীচে থেকে একখানা চিঠি বার করে শুভেন্দু সুরঙ্গমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল তারপর বললো—আজ হাসপাতালে যাবার পথে এই চিঠিখানা হারীত আমার হাতে দিয়েছিল। এ চিঠি যে তোমারই লেখা সে কথা বোধহয় তোমার অস্বীকার করবার আর কোন উপায় নেই। এতখানি বিষ বুকে নিয়ে কেমন করে ভালবাসার অভিনয় করছিলে ভেবে আশ্চর্য লাগে। অনেক কথাই বলেছো কিন্তু এই চিঠির কথা গোপন করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলে। কাল সারারাত আর আজ হাসপাতালে যাবার আগে পর্যন্ত মন চেয়েছিল তোমার কথাই বিশ্বাস করতে, ভেবেছিলাম আমিই হয়তো ভুল করেছি তোমার হয়তো সত্যিই কোন দোষ নেই কিন্তু এখন সব দ্বিধা কেটে গেছে।

অন্যমনস্কের মত শুভেন্দু কিছুক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইলো তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাস চেপে চেপে ফেলে আবার বললো—যাক্‌, এখন ওই চুড়ি বালা আর শাঁখার টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলে নাও

সকালবেলা চাকরেরা দেখে অবাক হবে। তোমার এই রূপান্তর চাকর-বাকর আর বাইরের লোকের চোখে কি রকম রূপ নেবে সেটাও একটু ভেবে দেখো। আর একটি কথা বলি, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না, দারজিলিং ছোট জায়গা এখানে শুভেন্দু ডাক্তারের স্ত্রীকে সবাই চেনে। কলকাতায় যাচ্ছি সেখানে গিয়ে তোমার যা ইচ্ছে কোরো।

সুরঙ্গমা মাথার মধ্যে সহস্র সূর্যের দাহ অনুভব করছিল যেন এখনই মাথাটা ফেটে যাবে, টল্‌তে টল্‌তে পাশের ঘরে গিয়ে সে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস তপ্ত কপালখানিকে ছুঁয়ে যেতেই আরামে তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে এল, সেই মুদিত চোখের কোণ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

॥ পনের ॥

দারজিলিংয়ে থাকতে সুরঙ্গমা জেনেছিল সঞ্জয় তার অফিসের প্রয়োজনে মাস দুয়েকের জন্যে বাইরে গেছে। তারপর অনেক দিন সে কোন চিঠিপত্র লেখেনি, কলকাতায় ফিরে এসেও দাদার কোন খোঁজ করেনি। তার জীবনের এ বিপর্যয় সে দাদাকে কেমন করে জানাবে ভেবে পায় না, দাদার জীবন তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে তা সে জানে। কিন্তু কি করবে সে, কোথায় যাবে, এমন দুর্বহ অসম্মানিত জীবনের ভার কেমন করে বহন করবে? এই কলকাতা শহরে আত্মগোপন করে ঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকা কতদিন সম্ভবপর হবে? অহরহ নিজেকে সে এই প্রশ্নই করে চলেছে এমন করে আর কতদিন চলবে?

বুকের ভেতরকার তপ্ত হাহাকার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে চারদিকের দেয়ালের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খায়, বাইরে বেরোবার তো পথ নেই। আকাশ যখন কালো হয়ে ঘন মেঘে ঢেকে যায় তৃষ্ণার্ত চাতকের

মত সে মুখ তুলে সেই দিকে চেয়ে থাকে। আসুক ঝড়, আসুক আকাশ ভেঙে দুরন্ত বর্ষণ, অগ্নিতপ্ত নিঃশ্বাসগুলোকে তার ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে যাক, আতপ্ত দেহমন তার শীতল হোক।

শুভেন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলেছিল কিন্তু সে কথা ভাবতে সুরঙ্গমার মন হাহাকারে ভরে যায়। শুভেন্দুকে ছাড়তে হবে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যেতে হবে—এ চিন্তা অসহ্য, না, না, উঃ তা সে কিছুতেই পারবে না।

শুভেন্দুর করুণা হয় ওর বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখ দেখে, ওর চোখের জল দেখে কিন্তু কি করতে পারে সে, কোনদিকে তো পথ নেই। নিজের ক্লান্ত দেহমন নিয়ে শুভেন্দু বিব্রত, দিনের বেলা হাসপাতালে অক্লান্ত ভাবে খাটে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সার্জন হয়েছে। ব্যস্ততা আছে, দায়িত্ব আছে। যতক্ষণ কাজে থাকে খুব ভালই থাকে, বাড়ীতে এলেই কে যেন পাঁচ মণ পাথর ওর বুকে চাপিয়ে দেয়। বন্ধুবান্ধবদের মুখ দেখায় না, কোথাও যায় না পাছে কোন প্রশ্ন ওঠে। রাত্রে কণ্টক শয্যায় শুয়ে ছট্‌ফট করে, ঘুম নেই। শরীর তার ভেঙ্গে পড়তে চায়, ভাবে—এমন করে আর কতদিন চলবে?

হাসপাতাল থেকে ফিরলে চাকররাই কাছে ছুটে আসে, প্রয়োজনে সাহায্য করে। খাবার সময় দুজনে এক টেবিলেই বসে কিন্তু কথা প্রায় হয় না, যেটুকু হয় তাতে সুর বাজে না।

সুরঙ্গমা জানে এই সময় পাশের বাড়ীর ফ্ল্যাটে আনন্দের সমারোহ জাগে। সুলতার স্বামী মহিমবাবু অফিস থেকে ফেরেন, সুলতা হাসিমুখে ছেলে কোলে নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে যায়। ছেলের সারাদিনের অসংখ্য দুষ্টুমির বিবৃতি তার মুখে শুনতে শুনতে মহিম বাবুর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অফিসের কাপড় না ছেড়েই ছেলেকে কাছে টেনে নেন। সুলতা তখন স্বামীর চা খাবারের

আয়োজনে যায়। তার আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে হাস্যমুখরতায় বিরল-সজ্জা ঘরগুলো স্পন্দিত হতে থাকে।

হায়, জীবনের এই সুষম ছন্দ তার কোথায় হারিয়ে গেল! স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর অনাবিল জীবনধারা খরতাপ বৈশাখের রুদ্রদহনে কেমন করে এমন শুকিয়ে গেল? দারুণ অনাবৃষ্টির অগ্নিদাহে বুকখানা তার ফুটিফাটা হয়ে গেল যে, আর তো সে পারে না।

সুরঙ্গমা সহজ হতে চায়, কিন্তু নিজের হাতে লেখা ওই চিঠির কথাগুলো রাতদিন তার বুকের মধ্যে কাঁটার খোঁচার মত তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধতে থাকে, তাকে সহজ হতে দেয় না। এই চিঠি সুরঙ্গমার জীবনের এক মস্ত বড় ভুল, মনের এক অসতর্ক মুহূর্তের দুর্বলতা। সেই ভুল তার জীবনকে যে এমন ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত করবে তা কে ভেবেছিল!

সেই যেদিন হারীতের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই উৎপাত থেকে ও মুক্তি পেল, কঠিন স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে সে তখন শ্রান্ত অবসন্ন। তারপর দিনে দিনে উত্তেজনার অবসানে ক্রমে নিরুদ্‌বিগ্ন সহজ দিনযাত্রার মধ্যে যখন সে ফিরে এল তখন সুরঙ্গমার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, পরাজিত লোকটা কি ভাবে দিন যাপন করছে তাই জানবার জন্যে কৌতূহল জন্মাল। আড়াল থেকে সে দেখতো হারীত ওই জানলায় বসে থাকে যেন বড় বিমর্ষ, মলিন। এই সময় তার মধ্যে এক বিচিত্র ভাবের উন্মেষ হল—হারীতের মনস্তত্ত্বের অনুশীলন করা। হারীতের প্রতি তার ব্যবহার হারীতকে কতখানি আঘাত দিতে পারে তারই পরিমাপ করতে চেষ্টা করা ওর হয়ে উঠলো নিভৃত চিন্তা, পড়াশোনা করতে করতে উন্মনা হয়ে ও ওই কথাই ভাবে।

ওর মনে হয়, হয়তো হারীত অকৃত্রিম ছিল, না-হলে দিনের পর দিন তার মনকে আয়ত্ত করবার জন্যে এমন করে লেগে থাকতে

পারতো না। সত্যিকার ভালবাসাকেই হয়তো ও উপেক্ষার আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে, সে আঘাত কঠিন হয়ে বেজেছে ওকে, তাই ও দুঃখ পাচ্ছে। দিনে দিনে সুরঙ্গমার মন নম্র হয়ে এল সহানুভূতিতে, করুণায়। তখনকার এক অসতর্ক মুহূর্তে সে ওই চিঠি লিখে বসলো—অনুতপ্ত। কাল দুপুরে আপনার জন্যে দরজা খোলা থাকবে।

দুপুর বেলা সঞ্জয় অফিসে আছে, পিসিমা দিবানিদ্রায় মগ্ন, চাকররা দূরে তাদের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে, এই নির্জন অবসরে সুরঙ্গমা হারীতকে দরজা খুলে দিয়েছিল। ও সরল মনে ভেবে রেখেছিল নিজের দুর্ব্যবহারের জন্যে হারীতের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে, ভেবেছিল ওকে জানিয়ে দেবে তাকে দুঃখ দিয়ে সেও দুঃখ পাচ্ছে। কিন্তু কোন কথার অবসর না দিয়ে হারীতের কামনালোলুপ মূর্তি যখন ওর অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এল তখন বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল, বুঝেছিল—কামের নগ্নরূপ ভালবাসার মুখোশ পরে তাকে ভুলিয়েছে। সেই সময় তার দাদার কথা মনে পড়েছিল, চরম অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে রাস্তায় বেরিয়েছিল, কেমন করে যে অমিতার কাছে পৌঁছেছিল তা সে জানে না। ওর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, আরক্ত মুখ দেখে অমিতা ওকে অসুস্থ মনে করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে শুশ্রূষা করেছিল, অনেক প্রশ্ন করেছিল কিন্তু কোন জবাব পায়নি।

এরপর আত্মগ্লানির পীড়নে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে। এ ঘটনাটাকে নিজের জীবন থেকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, দিনের পর দিন নিজেকে বুঝিয়েছে—এ তার কিশোর বয়সের অজ্ঞতার, ত্রুটি, অপরাধ এ নয়। মনে তো তার কোন অশুচিতা ছিল না, স্খলন তো তার ঘটেনি, তবে কেন সে দুঃখ পাচ্ছে? এমনি করে অনুতাপের গ্লানিকে আত্মবিশ্বাসের উত্তাপে গলিয়ে ক্ষয় করে সে নিজের ওপর শ্রদ্ধাকে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু সবচেয়ে

দুঃখদায়ক ছিল তার গুরু তার পরম প্রিয় দাদার কাছ থেকে লুকিয়ে গোপনে হারীতের সঙ্গে দেখা করার অপরাধ। এ অপরাধের গুরুত্ব তার পক্ষে অপরিসীম, কেন সে এমন ভুল করলো? তার স্নেহময় দাদার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবার অকুণ্ঠ অধিকার সে হারিয়েছে, কেমন করে সে এত বড় অন্যায় করলো? হায় রে, কেন সে এমন কাজ করলো?

রাত্রিদিন মনের দ্বন্দ্বে যন্ত্রণাময় অশ্রুক্লিষ্ট যে দিনগুলি তার কেটেছিল সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ পার হতে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তারপর এক সময় কেমন করে জানে না কে যেন তার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল, তার মন আবিষ্কার করলো—হারীতকে সে নিদারুণ ঘৃণা করে। অন্যায়কে সে ঘৃণা করে, কুৎসিতকে সে ঘৃণা করে, তার অন্তরে যে দেবতা বিরাজ করেন কোন অশুচিতা তাঁকে মলিন করতে পারে না।

এতদিন পরে সেই চিঠি হারীত সুরঙ্গমার চরম অপরাধের অকাট্য প্রমাণস্বরূপ শুভেন্দুর হাতে দাখিল করবে এ কথা সুরঙ্গমা স্বপ্নেও ভাবেনি।

শুভেন্দু ও সুরঙ্গমা কলকাতায় ফিরে এল কিন্তু আগেকার সেই দিনগুলিকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলো না। অতীতকে প্রাণপণে দুহাতে ঠেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে শুভেন্দুর পাশে দাঁড়াবার জন্যে সুরঙ্গমার ব্যাকুল মন রাত্রিদিন কেঁদে মরে কিন্তু জড়তার এক কঠিন শিকল তার পা দুখানাকে বেঁধে রাখে, কিছুতেই এগোতে দেয় না। সুরঙ্গমা ভাবে তার মনের মধ্যে তো কোন মলিনতা নেই, নেই কোন জটিলতা, তবে কেন সে সাহস করে এগিয়ে যেতে পারে না! অমিতার কথা মনে পড়ে, হায় অমিতার মত মনের জোর যদি তার থাকতো, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করবার শক্তি যদি তার

থাকতো। বেদনার সঙ্গে মনে হয় পাশের বাড়ীর মহিমবাবুর মতই শুভেন্দুও কর্মক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে কিন্তু গৃহে তার উৎসব-রাত্রির দীপ জ্বালিয়ে হাসিমুখে সুরঙ্গমা বসে নেই। শুভেন্দু কি তার গহন মনে এক মুহূর্তের জন্যেও সুরঙ্গমাকে প্রত্যাশা করে? হয়তো করে না। সে বুঝতে পেরেছে তার ক্লান্তি অপনয়নের জন্যে তার চিত্ত বিনোদনের জন্যে গৃহিণী সচিব সখী নর্মসহচরী তার আর পাশে এসে দাঁড়াবে না, জীবন নিঃসঙ্গ রিক্ত হয়ে গেছে।

শুভেন্দুর জন্যে সুরঙ্গমার বুক ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে।

॥ ষোল ॥

সঞ্জয় অনেকদিন সুরঙ্গমার কোন সংবাদ জানে না। পর পর দারজিলিংয়ের ঠিকানায় চিঠি লিখে, তার করেও কোন জবাব পায় না। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে সে কলকাতায় ফিরে এসে লোক পাঠালো। দারজিলিং থেকে যে সংবাদ নিয়ে এল তার মুখে শুধু এইটুকু জানা গেল হাসপাতালের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ডাক্তার তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। শুভেন্দুর বাবার কাছে চিঠি লিখলো। আরও নানা জায়গায় সন্ধান নিল, অবশেষে মেডিক্যাল স্টুডেণ্টদের যে হোস্টেলে শুভেন্দু আগে ছিল সেখানে অনেকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে একজন ডাক্তারের কাছে সঞ্জয় ওদের খবর জানতে পারলো। ডাক্তারটি শুভেন্দুর সতীর্থ ছিল। সে জানালো যে, শুভেন্দু কলকাতায় ফিরে এসে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়েছে। কখন তার সঙ্গে দেখা হতে পারে সে বিষয়ও সঞ্জয় জেনে নিল।

অবিলম্বে সঞ্জয় শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করলো কিন্তু ওর মুখে কোন কিছুই জানতে পারলো না, তবে ওর বাড়ীর ঠিকানাটা সংগ্রহ করলো।

সুরঙ্গমাকে দেখে সঞ্জয়ের কথা বলার শক্তি লোপ পেয়েছিল। সুরঙ্গমাকে যেন চেনা যায় না, নিষ্প্রভ চোখের কোলে কে যেন গাঢ় করে কালি মেখে দিয়েছে, রক্তলেশহীন কৃশ বিবর্ণ তার মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সঞ্জয় শুধুই চেয়ে রইলো, কিছুক্ষণ একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না। শুভেন্দু হাসপাতাল থেকে ফিরেছিল, তাকে সে জিজ্ঞাসা করলো—সুরঙ্গমা কি কোন কঠিন অসুখ থেকে উঠেছে?

শুভেন্দু সে কথার কোন জবাব দিল না, কেবলমাত্র বললো—আপনার বোনের মুখেই সব শুনতে পাবেন।—এই বলে সে নীচে নেমে গেল।

সুরঙ্গমা উচ্ছ্বসিত কান্নার ভারে ভেঙ্গে পড়লো। সঞ্জয়ের কোলের মধ্যে মুখ ঢেকে ছোট মেয়ের মতই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সংশয়ের যন্ত্রণায় সঞ্জয়ের দম বন্ধ হয়ে আসছিল কিন্তু সে ওর অবাধ অশ্রুর উচ্ছ্বাসকে বাধা দিল না, আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। অনেকক্ষণ কান্নার পরে সুরঙ্গমা শান্ত হয়ে মুখ তুললো, সঞ্জয় তাকে ধরে তুলে নিজের পাশে বসালো, পিঠের ওপর হাত রেখে বললো—আমাকে সব কথা খুলে বল দিদি।

মমতায়-ভরা দাদার যে চোখ তার সর্বাঙ্গে স্নেহপ্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছিল সেই চোখের দিকে চেয়ে সুরঙ্গমা আশ্বাস পেল।

তারপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সে খুলে বললো, নিজের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা কিছুই ঢাকলো না। প্রথম যৌবনোন্মেষের কালে যে রাহু তার জীবনে কালোছায়া ফেলেছিল তারই করাল গ্রাসে আজ তার জীবনের সৌভাগ্য কেমন করে নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেল সেই কথা বলতে বলতে সুরঙ্গমা রুদ্ধকণ্ঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো।

সঞ্জয়ের সমস্ত বুক যন্ত্রণায় দুমড়ে যাচ্ছিল, সে নিস্তব্ধ হয়ে

কিছুক্ষণ বসে রইলো তারপর এক বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে উঠে বসলো। ভাঙ্গা গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো—ভয় নেই খুকি, তোর জীবনকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না, আমায় একবার শুভেন্দুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

আস্তে আস্তে সঞ্জয় নীচে নেমে গেল। নীচে বসবার ঘরে শুভেন্দু একখানা চেয়ারে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল, সঞ্জয় ঘরে ঢুকে কয়েক মিনিট নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে ডাকলো—শুভেন্দু!

সঞ্জয়ের গলায় যেন জোর নেই। শুভেন্দু মুখ থেকে হাত সরালো, দুই চোখ তার রক্তবর্ণ, ভাবলেশহীন চোখে সঞ্জয়ের দিকে একবার চেয়েই সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিল। সঞ্জয় একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর পাশে বসলো, বললো—শুভেন্দু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শুভেন্দু নিঃশব্দ। সঞ্জয় আবার বলে—শুভেন্দু মুখ তোলো, আমার কথাগুলো শোনো।

আনত চোখেই শুভেন্দু একবার বললো—বলুন।—নিস্পৃহ নিরাসক্ত সে কণ্ঠস্বরে যেন বিশ্বের বৈরাগ্য ঝরে পড়ছে। সঞ্জয় একটু স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর বলে—ভুল করে দুজনের জীবনকে নষ্ট কোরো না শুভেন্দু!

শুভেন্দু এবার মাথা তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের মুখের দিকে চাইলো, বললো—ভুল? ভুল কাকে বলছেন, একে ভুল ভাবতে পারলে আমার চেয়ে বেশী সুখী কে ছিল? কিন্তু এ যে ভুল নয় তার প্রমাণ আপনার বোনের নিজের হাতে লেখা চিঠি।

সঞ্জয় একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো—কিন্তু এও তো হতে পারে ঐ চিঠি লেখার পরেই সুরঙ্গমা নিজের ভুল বুঝতে পেরে সরে এসেছিল, তা কি সম্ভব নয়? তুমি বিশ্বাস কর—সত্যি করে তাই ঘটেছিল শুভেন্দু।

সঞ্জয়ের কণ্ঠে কাতরতা।

শুভেন্দু কেমন ছট্‌ফট্ করে ওঠে। স্খলিত কণ্ঠে বলে—বিশ্বাস করতে পারছি না, আমায় ক্ষমা করুন।

সঞ্জয় আবার বলতে চায়—শুভেন্দু, তখন সুরঙ্গমার বয়েস ছিল কম, বুদ্ধি পরিণত হয়নি, এক সময়ে খেয়ালের বশে চিঠিখানা লিখে ফেলেছিল। শুধু ঐটুকুই ওর অপরাধ, তা কি একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য? একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে তাকি একবারও ভেবে দেখবে না? সুরঙ্গমা যে তোমাকে কত ভালবাসে—!

বাধা দিয়ে আর্তস্বরে শুভেন্দু চেঁচিয়ে উঠলো—না, না, না, আমি কিছুতেই পারবো না, যা একবার ভেঙ্গে গেছে তা আর জোড়া লাগবে না। আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমি বড় অসুস্থ আমার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে, দয়া করুন আমি আর কথা বলতে পারছি না।

অশক্তের মত শুভেন্দুর মাথাটা চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়লো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঞ্জয় ব্যথিত চোখে কয়েক মুহূর্ত তারদিকে চেয়ে রইলো তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

সঞ্জয় সুরঙ্গমাকে নিয়ে গেল। যাবার সময় শুভেন্দুকে বলে গেল—শুভেন্দু, তোমার দুঃখ যে কত বড় তা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আশৈশব সুরঙ্গমা যে শিক্ষা পেয়েছে, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে তাতে মিথ্যা ও বলতে শেখেনি। ও তোমার কাছে যা বলেছে সত্যিই বলেছে। তুমি যা সন্দেহ করেছ তা যে ওর পক্ষে কত বড় অসম্ভব, তা শুধু একমাত্র আমিই জানি। তোমার সঙ্গে ওর কম দিনের পরিচয়, তোমার পক্ষে একথা বিশ্বাস করা শক্ত তাও বুঝতে পারি। তবু প্রার্থনা করি তুমি যেন কোনও একদিন সত্যকে জানতে পার, যেন ওর নির্মল ভালবাসার

গভীরতাকে বুঝতে পারো। তুমি এখন উত্তেজিত অবস্থায় আছ, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, তুমি আর একবার ঠাণ্ডা মাথায় সব কথা ভেবে দেখো শুভেন্দু।

সঞ্জয় আর সুরঙ্গমা চলে গেল। অন্তরের হাহাকারকে প্রাণপণে সংহত করে শুভেন্দু ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

দিনের পর দিন যায়, জীবন মনে হয় নিষ্ফল হয়ে গেছে, শুভেন্দু যেন নিজেকে আর বহন করতে পারে না। যতদিন সুরঙ্গমা কাছে ছিল ততদিন সে তো বুঝতে পারেনি যে, তার অনুপস্থিতি ওকে এমন করে বিশ্বজোড়া শূন্যতায় ভরে দেবে, সকল দিন সকল রাত্রি তার এমন নিরাসক্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। এমন রিক্ত জীবন কেমন করে কাটাবে শুভেন্দু বুঝতে পারে না। তবে কি ক্ষমা করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনবে? সে অভিমানিনী হয়তো আর আসবে না, তার অন্ধকার ঘরে কল্যাণ হাতে আর সে দীপ জ্বালবে না, চিরদিনের মত শুভেন্দু নিঃশেষে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

রাত্রের অন্ধকারে শুভেন্দুর দুইচোখ নিঃশব্দে জ্বালা করে, তার-পর জলে ভরে ওঠে। তার পুরুষের অহঙ্কার লুটিয়ে পড়তে চায়। বারে বারে মন বলে—ফিরিয়ে আনো তাকে ফিরিয়ে আনো, তুমি নিজে যে না হলে মরে যাচ্ছ, ভুল হয়তো সে করেছে কিন্তু ভুল কি মানুষ করে না?

মাথা ঝাঁকি দিয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসে শুভেন্দু—না, না, তার প্রাণঢালা ভালবাসার ওপরে কালি ঢেলে দিয়েছে যে তাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। ঘরের মৃদু আলোতে বিশৃঙ্খল কেশ আরক্ত চোখ শুভেন্দুকে পাগলের মত দেখায়।

শুভেন্দুর জন্যে সঞ্জয়ের মন অনেকদিন অপেক্ষা করে ছিল। শুভেন্দু আসেনি।

মাস কয়েক পরে একদিন সঞ্জয় সুরঙ্গমাকে বললো—আমি অনেক ভেবে দেখলাম খুকি, ডিভোর্স করে তোদের তুজনকে আলাদা হতে হবে, এছাড়া আর পথ নেই।

জলভরা চোখে সুরঙ্গমা দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললো—কিন্তু বিচ্ছেদ তো চাইনে আমি দাদা, আমি যে তাহলে মরে যাব।

জোর দিয়ে সঞ্জয় বলে—না। তা হলে নিজেও বাঁচবি আর ওকেও বাঁচতে দে, ও যে কত তুঃখ পাচ্ছে তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। অন্ধকারে ও পথ খুঁজে পাচ্ছে না, ওর তুঃখ কম নয়।

— কিন্তু জুডিশিয়াল সেপারেশন যদি আমি চাই তাও তো হতে পারে।

বিষণ্ণ করুণ হাসি হেসে সঞ্জয় বললো—বোকা মেয়ে, তা হলে তো তোরা তুজনে তুজনের পথের কাঁটা হয়ে রইলি, স্বাধীনতা পাচ্ছিস্ কই? ওতো আর তা হলে বিয়ে করতে পারবে না।

—বিয়ে?—যেন আর্তনাদ করে উঠলো সুরঙ্গমা।

সঞ্জয় বলে—তোদের তরুণ জীবন, কেউ কাউকে বাঁধিসনে খুকি, মুক্তি দে। ওইটেই বাঁচার পথ, এখন যে তুজনেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস। এই অস্বাভাবিক জীবনকে টেনে নিয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, আলাদা হওয়া ছাড়া তোদের অন্য উপায় নেই। মনকে শক্ত কর, মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যার প্রতিবিধান করা সম্ভব হয় না তবু তার মধ্যে পথ কেটে মানুষকে চলতে হয়।

সুরঙ্গমার চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়তে থাকে, কঠিন সংযমে নিজেকে ধরে রেখে সঞ্জয় নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। একটু পরে হঠাৎ জোর দিয়ে হেসে উঠে বলে, তুই তো সাঁতার জানিস্‌নে খুকি, যদি কখনো জলে ডুবে যাস্, এবার রবিবারে রবিবারে তোকে লেক-এ নিয়ে গিয়ে সাঁতার শেখাব, কেমন?

সুরঙ্গমার চোখের জলে বৃষ্টিভেজা রোদের আভার মত ম্লান হাসি ঝিলমিলিয়ে ওঠে, মনে মনে বলে—ডুবে তো গেছিই, আর সাঁতার শিখে কি হবে!

॥ সতের ॥

ডঃ রায় কুশলকে মনে মনে স্নেহ করেন। সেই যেদিন অমিতার উৎসব অনুষ্ঠানকে দক্ষ শিল্পীর মত রূপ দিয়ে কুশল সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল সেদিনকার কথা তাঁর প্রায়ই মনে পড়ে। অমিতাকে বলেন—ছেলেটি ভারি ভালো, ওর কথা আমি ভুলতে পারি না। অল্প সময়ের পরিচয়ে ওর মধ্যে যে আদর্শ চরিত্রের আভাস আমি পেয়েছি তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি, আমার যদি ওর মত একটি ছেলে থাকতো আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম।

অমিতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—এতদিন তো তুমি কোনদিন ছেলের অভাব বোধ করনি বাবা, মেয়েই তোমার প্রাণ ছিল এখন একজন বাইরের লোককে মনে ঠাঁই দিয়ে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না বাবা।

ডঃ রায় হো হো করে হাসেন—অম্‌নি তোর রাগ হয়ে গেল, ভালোকে ভালো বলা কি অন্যায়?

—বল না কেন তুমি, একশোবার বল, আমি তো আর তোমার ভালো মেয়ে নই। ভারি তো ভালো, তুমি যে অমন করে আস্‌তে বলেছিলে একদিনও তো এলেন না। ডঃ রায় হাসেন, হাসতে হাসতে বলেন—দেখ্‌ বেবি, তুই ভারি অকৃতজ্ঞ, সে-দিন ও নিজে দায়িত্ব নিয়ে অমন করে তোর কাজটা উদ্ধার করলো আর তুই ওর নিন্দে করছিস্? শুভেন্দুর কাছে শুনেছিলাম ও ডক্টরেটের জন্যে তৈরি হচ্ছে, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছে হয়তো।

ডঃ রায় কুশলকে বলেছিলেন, যদি আপনার সময় হয় আমার সঙ্গে দেখা করলে সুখী হব।

আপনি সম্বোধনে আপত্তি করে কুশল সেদিন বলেছিল, আমি আপনার ছেলের মত। সে কথা ডঃ রায়ের মনে আছে, ভালো লেগেছিল কথাটি। কুশলেরও প্রতিশ্রুতির কথাটা মনে আছে কিন্তু কোন উপলক্ষ না থাকায় শুধু শুধু যাওয়াটা তার কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়, অতখানি ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়। এর মধ্যে আরও একটা কি যেন ছিল কুশল ঠিক ধরতে পারে না, সেটা বোধহয় মার মনের সেই ইচ্ছার প্রকাশটা। দ্বিধা করতে করতে যখন অনেক দিন কেটে গেল তখন অকারণে গিয়ে দাঁড়ানো যেন একটা লজ্জার বিষয় মনে হতে লাগলো। এমনি করে আরও কিছুদিন কেটে গেল।

শুভেন্দু কুশলের বন্ধু। তার মুখেই সে শুনেছিল ডঃ রায়ের মেয়ে বাগ্‌দত্তা। অমিতার উৎসব দিনে তার ভাবী স্বামীকেও সে দেখেছে। আরও সেই জন্যেই. অমিতা পাছে কিছু মনে করে বসে এই ভেবেও ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সাহস পায়নি। শুভেন্দু ওদের আত্মীয় তা সে জানে, কুশল ভাবে শুভেন্দু যদি কলকাতায় থাকতো তবে তার সঙ্গে ও হয়তো অসঙ্কোচে যেতে পারতো কিন্তু সে তো এখানে নেই, বিয়ের পরে চাকুরী নিয়ে দারজিলিং চলে গেছে। নিরুপায় হয়ে কুশল ডঃ রায়ের অনুরোধ রাখতে পারে না। মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে ভাবে ওঁরা ওকে কি অভদ্রই না ভাবছেন কিন্তু ভদ্র হবার মত মনের জোরও পায় না।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ কমলালয় স্টোর্সে অমিতার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কুশল ওকে দেখে বলে উঠলো—আপনি?

অমিতা একটু হেসে উত্তর দিলো—চিনতে পারলেন?

দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। কুশল বললো—দেখুন, আমি কথা দিয়েও আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করিনি সে অপরাধ তিনি যেন ক্ষমা করেন।

অমিতা বলে—না, না, ক্ষমার কি আছে, আপনার ইচ্ছে হয়নি তাই যাননি, কোন বাধ্যবাধকতা তো নেই।

কুশল অপ্রস্তুত হল। অমিতার কথার ভাবটা যেন কেমন কেমন, সন্দেহ হয় একটু অভিমানের সুর লেগেছে, কিন্তু কেন? ওঁর বাবাকে অসম্মান করেছি এই কথাই যদি উনি ভেবে নিয়ে থাকেন তবে তো সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে। একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললো—আমি বুঝতে পারছি আপনার কাছেও আমার ক্রটি হয়ে গেছে, আমি কিছুদিন থেকে পড়াশোনা নিয়েও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু এটাই দেখা না করবার কারণ তা বলতে পারিনে, তবে—

অমিতা বললো—না, না, আপনি কিছু ভাববেন না, বাবা কিছু মনে করেননি। সকলেরই তো নিজের নিজের কাজ আছে—অকাজের খাতিরে তো কাজ নষ্ট করা যায় না।

কুশল ভয়ানক অপ্রতিভ হয়, আর তার মুখে কথা যোগায় না। কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে সে একেবারে অধোবদন হয়।

অমিতা আড় চোখে ওর দিকে তাকায়, বাক্যে অপটু লোকটার ওপর করুণা হয়। ভাবে, এই লোকটাই কেমন করে ক্লাসে অজস্র ভাষ্য টীকা দিয়ে অবলীলায় বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বোঝায়, তখন কোথা থেকে ওর মুখে এত কথা যোগায়?

অমিতা আস্তে আস্তে বলে—বাবা সত্যি আপনাকে আশা করেন, যদি যেতে পারেন।

এবার কুশল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে—আমি নিশ্চয় যাব, আমাকে মিথ্যেবাদী ভাববেন না।

অমিতা মুখ টিপে একটু হাসে। কথা বলার অক্ষমতার জন্যেই কুশলের বন্ধুর সংখ্যা কম। যে দুই একজন আছে তারা খুবই ঘনিষ্ঠ যেমন শুভেন্দু। কথা শুভেন্দুও কম বলে কিন্তু সে অপটুতার জন্যে নয় সংযতবাক্ বলে, কিন্তু ওদের দুজনের যখন দেখা হয় তখন কথা কম বলার বাধা মনকে আড়াল করে না।

কুশলের মা ছেলেকে বলেন, তুই এত ঘরকুণো কেন হয়েছিস্ বলতো? ঘরের কোণে বসে কেবল বইয়ে মুখ ডুবিয়ে থাকিস্, পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলাপ করবি তা নয়, ওই জন্যে তো তোকে কেউ চেনে না।

কুশল হেসে জবাব দেয়—তুমি তো আমায় চেন মা তা হলেই আমার হল। বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলা আমার আসে না, নাই বা লোকে চিনলো।

ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খল চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে মা বলেন—রাতদিন এত পড়াশোনা করতেও তোর ভাল লাগে, কি অত লিখিস্ বলতো?

—একটা 'থিসিস্' লিখছি মা, তাই অত বইপত্র ঘাঁটতে হচ্ছে।

মা বলেন—তোর তো বই সঙ্গী আছে আর আমার বুঝি কোন সঙ্গীর দরকার নেই?

মার অভিমানের কণ্ঠ কুশল বুঝতে পারে, মুখ তুলে হেসে বলে—তোমার ছেলেকে নিয়ে কি তোমার মন ভরে না মা, আরও সঙ্গী চাও?

মা চুপ করে থাকেন কিন্তু কুশলের চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, বই পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়। মার আকাঙ্ক্ষাকে মনে মনে রূপ দেবার চেষ্টা করে কিন্তু নিজেকে যেন ঠিক তার মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারে না।

অমিতার সঙ্গে দোকানে দেখা হবার কিছুদিন পরে কুশল একদিন মিথ্যাবাদের দুর্নামকে সুযোগ না দেবার জন্যেই সব সঙ্কোচ কাটিয়ে ডঃ রায়ের বাড়ীর গেটে ঢুকে পড়ে। ডঃ রায় বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে ছিলেন, তাকে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন, আগ্রহ ভরে হাত বাড়িয়ে দেন—এসো, এসো কুশল, তোমার জন্যে অনেক দিন থেকেই মনটা প্রতীক্ষা করছে।

এতখানি সমাদরের জন্যে কুশল প্রস্তুত ছিল না, কেমন থতমত খেয়ে যায়, লজ্জিত ভাবে বলে—আমি অনেক দিন আসতে পারিনি।

ডঃ রায় বলেন—আমি জানি, তুমি ডক্টরেটের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছ, না আসতে পারায় তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই, চল, ঘরে বসবে চল।

ডঃ রায় নানারকম আলাপ করেন, কুশলকে ছাড়তে চান না। ধরিত্রী দেবীকে ডাকেন, বলেন—এই যে কুশল এসেছে, একটু চা কর। সেবারে তোমার মেয়ের কাজে কত খেটেছিল মনে আছে তো?

কুশল লজ্জিত হলো কিন্তু ভদ্রতাসূচক কোন কথাই বলতে পারলো না। পালাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়েছিল, শঙ্কিত ছিল কখন বা অমিতা এসে পড়ে আর বলে বসে—যাক্ এতদিনে তো তবু আসতে পারলেন। অমিতার সামনে সে পড়তে চায় না, প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করেছে এ কথা তো শুনতেই পাবে তারপরে আর ওর সম্বন্ধে তার অভিযোগের কোন কারণ থাকবে না।

বিদায় নেবার জন্যে কুশল উঠে দাঁড়াতেই ডঃ রায় হঠাৎ বলে উঠলেন—ও, অমিতার সঙ্গে তো তোমার দেখা হল না, আচ্ছা ওর সঙ্গেও একবার দেখা করে যাও। ও একটু অসুস্থ আছে, চল আমরা ওর ঘরেই যাই।

অমিতার আশীর্বাদের কয়েকদিন পরের কথা। অমিতা দুর্বল হয়েছে, প্রায় শুয়েই থাকে, চিকিৎসা চলছে।

ডঃ রায়ই প্রথমে অমিতার ঘরে ঢুকলেন, বললেন—বেবি, কুশল এসেছে। ও চলে যাচ্ছিল, তোর সঙ্গে দেখা করাবার জন্যে ওকে নিয়ে এসেছি। কুশল, তোমরা কথা কও, বসো, বাইরে কে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দেখি।

কুশল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অমিতা ব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, হঠাৎ ওর মাথাটা ঘুরে ওঠে, খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে ও চোখ বোজে, কুশলের সেটা চোখে পড়ে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুশলের দিকে অমিতা হাসিমুখে তাকায়, সাগ্রহে বলে—ভেতরে আসুন।

আস্তে আস্তে কুশল এগিয়ে যায়। একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে অমিতা বলে—বসুন।

কুশল বসলো। কি বলবে ভেবে পায় না, কতকটা দ্বিধার সঙ্গে বলে ফেললো—বড় অসময়ে এসে পড়েছি—আপনি অসুস্থ, এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসাটা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি।

অমিতা মুখ নীচু করে একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে—আমি তো জানতাম আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অসময়েই দেখতে আসে, আপনার যদি ভালো না লাগে তবে জোর করে বসতে বলবো না।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অমিতা চোখের জল ঠেকায়, শরীরের সঙ্গে মনটাও ভারি দুর্বল হয়ে গেছে, সহজেই চোখে জল আসে।

কুশল বিস্মিত হয়। এও তো অভিমানের কথা, কিন্তু কিসের এ অভিমান! সে তো ভালো কথাই বলতে চেয়েছে, অমিতার কানে সেটা এমন বেসুরো হয়ে বাজলো কেন? এর আগে যখন এখানে আসেনি তখন অভিমান হয়তো হয়েছিল আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল বলে, কিন্তু আজ তো ওকে অসুস্থ অবস্থায় সহানুভূতি জানাবার জন্যেই ও কথাটা বলেছে এতে কেন এমন উল্টো উৎপত্তি হল?

কুশল আবার কথা হারায়, তারপর একসময় ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে—আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আপনার কষ্ট হচ্ছে।

অমিতা আস্তে আস্তে খাটের ওপর বসে পড়ে, তারপর বলে—আমার সঙ্গে দেখা না করেই তো চলে যাচ্ছিলেন, বাবা ধরে এনেছেন তাই, নইলে তো আমার সঙ্গে দেখাই হতো না। যাক, কথা রাখতে তবু তো এসেছেন এই আমাদের সৌভাগ্য।

এবার আর বুঝি চোখের জল বাধা মানে না, কিন্তু এ তো অমিতার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, এ যে তার লজ্জা, কুশল তার কে,

তার সামনে কেন সে চোখের জল ফেলবে? শরীরের দুর্বলতা এমন অসময়ে মনকে আশ্রয় করলো কেন?

দুই হাতে মুখ ঢেকে অমিতা নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করে।

নিঃশব্দ কুশল হতভম্ব হয়ে বসে থাকে। তরুণী মেয়ের মনের রহস্য তার জ্ঞানের আয়ত্তে নেই, কোন্ কথায় এরা কেমন করে দুঃখ পায় তা সে বুঝতে পারে না, কিন্তু মনে একটু সন্দেহ হয় যে, অমিতা বোধহয় তার ওপর কোন দাবি রাখে, কিন্তু সেটা কিসের দাবি? কুশল ধরতে পারে না।

বাড়ীতে ফিরে এসে ঐ কথাই কুশলের মনে হয়। অমিতার কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করে আর মনের নিভৃতে কোন অজানা জায়গায় ঐ অভিমানের কথাগুলি যেন মাধুর্যের ছোঁয়া লাগায়।

॥ আঠার ॥

অনিন্দ্য চাকুরীতে যোগ দিতে দুর্গাপুরে চলে গেছে কারণ বিয়ের দিন অনিশ্চিত ভাবে পেছিয়ে গেল। বিয়ের পরে অমিতাকে নিয়ে ওখানে গিয়ে স্থির হয়ে কাজে যোগ দেবে ভেবেছিল কিন্তু অমিতার অসুস্থতার জন্যে ডঃ রায় নির্দিষ্ট তারিখে বিয়ে দিতে রাজী হননি। বরপক্ষ এতে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত, তাঁরা অধৈর্য হয়ে চিঠিপত্র লিখছেন কিন্তু ডঃ রায়ের মন কিছুতেই এ অবস্থায় বিয়েতে সায় দিতে প্রস্তুত হচ্ছে না। নানারকম চিন্তায় তাঁর মন আলোড়িত হয়, তবে কি এ বিয়ের সম্বন্ধে অমিতার মন বিরূপ? কিছু বুঝে উঠতে পারেন না, মানসিক সঙ্কটে অশান্তি ভোগ করেন।

ধরিত্রী দেবী বলেন—তুমি এত দ্বিধা করছো কেন, বিয়ে দিলেই মেয়েদের শরীর ভাল হয়, দেখো বিয়ের পরে মনের খুশীতে ও সেরে উঠবে। নিজের সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আনন্দে সংসার করবে।

ডঃ রায় জবাব দেন না। ধরিত্রী দেবী আবার বলেন—তুমি যে রাতদিন কি ভাবো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। এতদিন থেকে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আত্মীয় স্বজন সবাই জানে, তারা মনে করছে কি?

গম্ভীর মুখে ডঃ রায় আস্তে আস্তে বলেন—এ বিয়ে হয়তো না-ও হতে পারে।

ধরিত্রী দেবী আঁতকে ওঠেন—বল কি তুমি? এমন উপযুক্ত ছেলে, দেখতে শুনতে ভালো, মোটা মাইনে, সম্ভ্রান্ত ঘর—এমন পাত্র তুমি পাবে কোথায়? তাছাড়া এতদিন থেকে ঠিক হয়ে আছে, আর সবচেয়ে বড় কথা, ওদের দুজনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা! তুমি যে কি অদ্ভুত কথা ভাবো আমি তা ধারণাই করে উঠতে পারি না!

ডঃ রায় বলেন—আমি মনস্থির করে উঠতে পারছি না।

সংশয়ের বিড়ম্বনা ডঃ রায়কে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। মনে হয় কোথায় যেন একটা অন্যায় আছে, অত্যাচার বলা যায় হয়তো। অমিতা কি শুধু সামাজিক লজ্জায়, বাপ মায়ের সম্মান নষ্ট হবার ভয়ে এ বিয়েতে অসম্মতি জানাতে পারছে না, না কি সে সত্যিই অনিন্দ্যকে চায়? না, না, লোকনিন্দার ভয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারবেন না, এতে লোকে তাঁকে যতই ধিক্কার দিক্ সব মাথা পেতে নেবেন।

অমিতার হিস্টেরিক ফিট মাত্র বার দুই তিন হয়েছিল কিন্তু সে যেন ক্রমশঃ রক্তহীন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। চিকিৎসক বলেন, হার্ট দুর্বল এ অবস্থায় বিয়ে দেওয়া উচিত নয় বরং বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া উচিত যাতে শরীর মনের পরিবর্তন হয়। ডঃ রায়ও সে বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, এক সময় এ প্রস্তাবটা অমিতার কাছে করলেন।

অমিতা বললো—বাইরে যাবার দরকার কি বাবা, তুমি এত ব্যস্ত হয়ো না।

বাবা বলেন—তুই দিনে দিনে যেন রোগা হয়ে যাচ্ছিস্!

অমিতা হেসে বলে—ও তোমার চোখের ভুল বাবা, আমি তো ভালই আছি।

—তাহলে কি বিয়ের দিন স্থির করবো? তোর কাছেই আমি জানতে চাই বেবি।

বেবী করুণ চোখে বাবার মুখের দিকে তাকায়। ক্লিষ্টস্বরে বলে—সে তোমরা জানো, আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো? আমি কি বিয়েতে অমত করেছি কখনও?—বেবীর চোখ জলে ভরে ওঠে অকারণে, ডঃ রায়ের চোখে সেটা এড়ায় না, তিনি বাঁ হাতের বেষ্টনে মেয়েকে কাছে টেনে নেন্, তাঁর আরাম কেদারার হাতার ওপর অমিতা বসে।

ডঃ রায় বলেন—বেবি, আমায় সত্যি করে বল্, লুকোসনে, তোর কি মনে হয় এ বিয়েতে তুই সুখী হবি?

—কেন হবো না বাবা, তোমরা সবদিক দেখে শুনে আমাকে সুখী করবার জন্যই তো এ সম্বন্ধ স্থির করেছ।

—তবু আমার সন্দেহ হচ্ছে বেবি, তুই বল্, সর্বান্তঃকরণে বল্ যে শুধু আমাদের কথা ভেবেই তুই এ বিয়েতে রাজী হচ্ছিস্‌নে, তোর নিজেরও ইচ্ছে আছে।

অমিতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে দুই হাতে মুখ ঢাকলো। ডঃ রায় তাঁর মেয়েকে চেনেন, এ মেয়ে তাঁর নিজের হাতে গড়া, ছোট বেলা থেকে এ মেয়ে জেদী, মনের শক্তিতে দুর্জয়। কোথাও সে হার মানে না, কোথাও নত হয় না, আত্মমর্যাদাবোধ তার প্রখর। তিনি জানেন চোখের জল তার সুলভ নয়, সহজে সে আত্মপ্রকাশ করে না, এ চোখের জলের গভীর অর্থ আছে।

তাঁর চিন্তার জটিল গ্রন্থি ক্রমে ক্রমে খুলে যেতে থাকে, তিনি অমিতার পিঠে হাত রাখেন,—তবে এ বিয়ে ভেঙ্গে দি, তোর অমত নেই তো?

অমিতা রুদ্ধস্বরে বলে—বিয়ে আমি মোটেই করব না বাবা।

চিন্তাকুল ডঃ রায়ের মনের জটিল গ্রন্থিজাল এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ খুলে যায়।

মাস দুই কেটে গেছে, অনিন্দ্য এর মধ্যে একবার এসেছিল। অমিতার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, কি যে অসুখ বাধিয়ে বসলে। এ সব দুর্বল চিত্ততা, হিস্টেরিয়া ফিস্টেরিয়া আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে। তোমার মনের ইচ্ছাটা কি শুনতে চাই।

অমিতা কোন উত্তর দেয়নি। নতুন কাজে অনিন্দ্যর ছুটি কম, একদিন পরেই ফিরে যায়, অমিতার কাছে কোন জবাব সে পায়নি।

ওদিকে বরপক্ষ থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করে চিঠি আসে—ছেলের বিয়ে না দিলে এখন আর চলে না, একলা থাকাতে তার অসুবিধে হচ্ছে, অনেকদিন তো কেটে গেল। ডঃ রায় তাঁর মনোগত ইচ্ছা যেন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন, যদি তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক থাকেন তবে বরপক্ষ ছেলের বিয়ের অন্য চেষ্টা করবেন।

ধরিত্রী দেবীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়, তিনি আকুলি বিকুলি করতে থাকেন, স্বামীকে অনুনয় করে বলেন—ওগো তুমি অবুঝ হোয়ো না, ওঁদের ভাল করে চিঠি লিখে দাও।

ডঃ রায় উত্তর দেন—আমি অবুঝ নই, ভাল করে বুঝে দেখেছি এ বিয়েতে আমার মেয়ের ইচ্ছে নেই।

ধরিত্রী দেবীর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, অনিন্দ্যকে তিনি স্নেহ করেছিলেন।

কিছুদিন পরে জানা গেল, অনিন্দ্য বিয়ে করেছে। ধনী ঘরের এক সুন্দরী কন্যাকে তার বাপ মা বধূরূপে বরণ করে ঘরে নিয়ে এসেছেন।

এ সংবাদ জানবার পরে অমিতা নিজের মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে, কোথাও কি, মনের কোন কোণে এতটুকুও কি বেদনা বোধ আছে? কিন্তু কোথাও বিকার খুঁজে পায় না বরং মনে হয় বাগ্‌দত্তা নামের একটা নাগপাশের বাঁধন খুলে পড়ে তাকে যেন মুক্তি দিয়ে গেছে। মনে মনে প্রার্থনা করে অনিন্দ্য সুখী হোক্, তার মনের মত স্ত্রী হয়তো সে এখন পেয়েছে, অমিতা তার মনের মত ছিল না, অনেক অসঙ্গতি তাকে দুঃখ দিয়েছে। অমিতা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে এবার সে সুখী হোক্।

॥ উনিশ ॥

সুরঙ্গমা সঞ্জয়ের সামনে হাসিমুখেই এসে দাঁড়ায় কিন্তু সঞ্জয় তার এ ছদ্মাবরণকে চেনে। এ হাসির আড়ালে যে অশ্রুর অকূল সমুদ্র লুকিয়ে আছে সে কথা তার চেয়ে আর কে জানে? কেমন করে ওর জীবনের গতি ফিরিয়ে দেওয়া যায়, জীবনের ক্ষয় ক্ষতি ওর কি দিয়ে পূরণ করা যায় তাই তার দিনরাত্রির ভাবনা।

সঞ্জয় বলে—আমার ইচ্ছে তোকে আবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দি' ডাক্তারি ডিগ্রীটা পেলে অনেক সুবিধে হবে।

সুরঙ্গমা উত্তর দেয়—কি দরকার দাদা ডিগ্রী দিয়ে? ওতে কি আমার সান্ত্বনা আসবে?

—দেখ খুকি, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, মনে জোর আনতে হবে তোকে। এত বড় পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে, মেয়েরা শুধু স্বামী আর সংসার নিয়ে মেতে থাকলে আজকের জগতে তা চলে না। তুই তো দেখেছিস্ হাসপাতালে নার্সের কত অভাব, দেখেছিস্ দরকারের তুলনায় ডাক্তার কত কম। যুগের প্রয়োজনে কত মেয়ে ছোট সংসারের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা না পড়ে বড় সংসারের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, তুই কি তাদের চেয়ে ছোট? বাইরের

জগৎ তোদের চায়, তুই যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলি সে কথা কি ভুলে গেছিস্ ? তোর নিজেকে নিজে মর্যাদা দিতে হবে খুকি।

অনেক বড় কথা বলে সঞ্জয় সুরঙ্গমার মনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চায় কিন্তু তা সুরঙ্গমার মনকে স্পর্শ করছে বলে মনে হয় না, তার চোখে জল টল্‌টল্ করে। সঞ্জয় সহসা মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় রুমালে চোখ মুছে আবার বাইরে আসে, হাসতে হাসতে বলে—তোদের মহিলা কবি কামিনী রায় কি যেন লিখেছেন—'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

কঠিন জীবন সমস্যার ওপরে হাসির আলোকপাতে সঞ্জয় তাকে লঘু করে দিতে চায়, সুরঙ্গমার জলভরা চোখও ম্লান হাসির আভায় চক্‌চক্ করে ওঠে। দুঃখের গুরুভারকে হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ওকে নতুন করে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ করে দিতে সে ব্যস্ত তবু সুরঙ্গমা জানে তার জীবনের নিষ্ফলতায় সঞ্জয়ের জীবনও বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মেডিক্যাল কলেজে শুভেন্দু আছে, সুরঙ্গমা তার সামনে পড়তে চায় না। জীবনের যে দুঃখময় পরিচ্ছেদকে অতিক্রম করে এসেছে তার সম্মুখীন হবার আর তার সাহস নেই। হয়তো শুভেন্দুর মুখোমুখী হয়ে গেলে ভেঙ্গে পড়বে সে, সে দীনতার লজ্জা স্বীকার করতে চায়না সুরঙ্গমা। সঞ্জয়ও ভাবে শুভেন্দুর সামনে পড়লে হয়তো ও আরও দুর্বল হয়ে পড়বে এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। অনেক ভেবে স্থির করে—এখানকার অসুস্থ মানসিক পরিবেশ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই বোধহয় ভালো হবে। বাইরে বিদেশে শিশুদের রোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবে ও, শিশুদের সাহচর্য ওর জীবনকে সরস করবে। এখানে ফিরে এসেও ওই কাজ নিয়েই থাকবে, সেই ভালো। আর যদি কোনদিন সম্ভব হয়, কেউ ওকে শ্রদ্ধার সঙ্গে

গ্রহণ করে তবেই হয়তো আর একবার ওর জীবনে সুখ ফিরে আসবে। সঞ্জয় মনে ভাবে তাই হোক, আর একবার ওর জীবনে সেই সুযোগ আসুক যাতে ওর ব্যর্থতার বেদনা মুছে যায়।

ডঃ মাস্কার বোম্বাইয়ের ছেলে। তার পুরোনাম কৃষ্ণরাও এস্ মাস্কার। ভারতে থাকতেই সঞ্জয়ের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল; তারপর পড়াশোনার জন্যে দুজনেই একসঙ্গে বিদেশে যায়। লণ্ডনে দুজনে এক ফ্ল্যাটেই থাকতো, ওদের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সুরঙ্গমা কৃষ্ণরাওকে বরাবরই দাদা বলে। এদেশে থাকতে কলকাতায় ও প্রায়ই ওদের বাড়ীতে আসতো, বন্ধুর সুন্দরী মধুর-ভাষিণী বোনটিকে ও খুব স্নেহ করতো। সঞ্জয়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকেই ও কফির ফরমাস দিত, সুরঙ্গমা জানে ঐ জিনিসটাতে ওর আসক্তি প্রবল; চাকরের হাতে না দিয়ে সে নিজেই যত্ন করে ওটা তৈরি করতো। কৃষ্ণরাও আপত্তি করলে বলতো, না, ওরা ভালো পারবে না।

সঞ্জয় হো হো করে হেসে বলতো—করতে দাও হে কৃষ্ণরাও, যতই লেখাপড়ার দিকে ঠেলে দাও না কেন রান্না বান্না যেমন মেয়েদের টানে এমন আর কিছুই নয়। আর ওর হাতটাও ভালো, সর্ষেবাটা দিয়ে মাছের ঝাল যা রান্না করে, চমৎকার! আর মাছের চপটাও—

সুরঙ্গমা চেঁচামিচি করে—আঃ দাদা, তোমার জ্বালায় আর পারিনে। কৃষ্ণদা, তুমি ওই চপ ক'টা খাও তো, কফিটাই শুধু টেনে নিলে!

সঞ্জয় বলে—শুধু খাবার খাওয়ালেই চলবে না, তোর হাতের মাছের ঝালটাও ওকে খাওয়াতে হবে। তুই রাগ করছিস্ কেন খুকি, তোর জন্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা চালাচ্ছি যাতে তোর রান্নার যশ ছড়িয়ে পড়ে, তুই তো তাই-ই চাস্।

সুরঙ্গমা অভিমানে মুখ ভার করে, সঞ্জয় ওর চুলের বেণীটা

টেনে দিয়ে বলে—যা, যা, আর রাগ করতে হবে না, আমার কফি টফি চ'লবে না, চা নিয়ে আয়।

সুরঙ্গমা ছুটে চলে যায়।

লণ্ডন থেকে পরীক্ষায় পাশ করে সঞ্জয় ভারতবর্ষে ফিরে আসে কিন্তু কৃষ্ণরাও ওই দেশেই থেকে গিয়েছিল। সে জিন্ রেনো নাম্নী একটি সুইস্ মেয়েকে বিয়ে করে এবং জেনিভাতে ইণ্ডিয়ান কনস্যুলেট-এ চাকুরী নেয়।

স্টেশনের সামনে 'রু দ্য লোজান'-এর ওপর একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে ওরা। কৃষ্ণরাও জিন্‌কে বলে—তুমি জিন্ নও তুমি এণাক্ষী।

জিন্ সানন্দে বলে—তোমার দেওয়া ভারতীয় নাম আমি স্বীকার করে নিলাম। তোমাকে ভালবাসি তাই তোমার দেশকেও আমি ভালবাসি, তোমার দেওয়া নামটা আমার ভাল লেগেছে।

কৃষ্ণরাও একদিন বলে—এণা, আমার একটি ভারতীয় বোন শীগ্‌গিরই এদেশে আসবে, ভারি ভালো সে, দেখো, তাকে তোমারও খুব ভালো লাগবে।

জিন্ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সুরঙ্গমার সম্বন্ধে লণ্ডনে যা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে সে বিষয়ে সঞ্জয় কৃষ্ণরাওকেই লিখেছিল।

॥ কুড়ি ॥

সুরঙ্গমা লণ্ডনে এক মারাঠী পরিবারে থাকে। মারাঠী মেয়ে তারাবাই দাণ্ডেকারের স্বামী রামচন্দ্র নারায়ণ দাণ্ডেকার ওখানে একজন ব্যবসায়ী। অনেক বছর থেকে তাঁরা ওখানেই আছেন। কৃষ্ণরাওয়ের সঙ্গে এঁদের বিশেষ পরিচয় আছে তাই কৃষ্ণরাও সুরঙ্গমাকে ওখানেই রাখবার ব্যবস্থা করেছিল। এঁরা পেয়িং গেস্ট রেখে থাকেন্ এবং অতিথির ওপর খুব সহৃদয় ব্যবহার করেন।

বিশাল লণ্ডন শহরে সুরঙ্গমার বিশেষ পরিচিত কেউ নেই, বড় নিঃসঙ্গ লাগে। কিছুদিন পর পর কখনও সে কৃষ্ণরাও ও জিনের কাছে যায়।

শুভেন্দুর প্রতিদিনের সঙ্গ ওর জীবনকে কেমন করে এত বেশী জড়িয়ে ধরেছিল তা ভেবে ওর বিস্ময় লাগে। এতবড় পৃথিবী, এমন তার বিস্তার, কত তাতে বৈচিত্র্য, শুভেন্দু নামে একমাত্র মানুষ-বিন্দুতে তার সমস্ত সত্তা কেমন কবে কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল তা সে ভেবে পায় না। ভালবাসাই যদি একমাত্র যোগসূত্র হয় তবে সে সূত্র কি এমন ক্ষীণ এত দুর্বল ছিল যা এত সহজেই ছিঁড়ে যায়? যেখানে বিশ্বাসেব শক্ত খুঁটি নেই সেখানে ভালবাসা মিথ্যে, সে-শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানের মত একটা সামাজিক শোভনতা মাত্র।

রাত্রিতে বিছানায় নরম উষ্ণতার মধ্যে ডুবে গিয়েও ঘুম তার দুই চোখকে জড়ায় না, মনে উষ্ণতা তাকে জাগিয়ে রাখে। মনে হয়, শুভেন্দুব ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার তার হয়তো অধিকার নেই কারণ সুরঙ্গমা প্রতিপক্ষ, সে নিরপেক্ষ বিচারক নয়। হয়তো শুভেন্দু নিজের চোখে যা দেখেছে তার ভুল বোঝবার পক্ষে, আঘাত পাবার পক্ষে এর জোরালো যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না, তার চেয়েও জোরালো প্রমাণ তার নিজের হাতে লেখা চিঠি। কিন্তু ভালবাসা যদি এর চেয়েও শক্তিমান হত তবে সুরঙ্গমার চোখের জল আর বুকভাঙ্গা আবেদন কি এমন নিরর্থক হয়ে যেত শুভেন্দুব কাছে?

শুভেন্দু তাকে এমনই হেয় ভেবেছিল যে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা সে করবে ভিক্ষুকের মত, কেন, এ-কথা ভাববার তার কি অধিকার? আত্মমর্যাদা ওর বুকের মধ্যে মাথা তুলে গর্জে ওঠে, আমি সুরঙ্গমা, আমি আমিই, এ জগতে কোন স্বার্থের লোভে আমি কারো সেবাদাসী হতে চাই না।

ঘুম হয় না তাই ক্লান্তি তার মোটেই দূর হয় না। সকাল বেলা চায়ের সময় তারাবাই ওকে ডেকে তোলে, ওর মুখের দিকে চেয়ে

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—তুমি কি রাত্রে ঘুমোও না, তোমার চোখের কোলে এমন কালি পড়েছে কেন?

সুরঙ্গমা বিষণ্ণ হাসি হাসে, তারাবাইয়ের কোল থেকে তার ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটাকে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে। কলকাতায় পাশের বাড়ীর সেই সুলতার কথা মনে পড়ে তার, তাদের আনন্দিত জীবনযাত্রাকে দারিদ্র্য ব্যাহত করতে পারেনি, শ্রম তাদের ক্লান্ত করেনি, সন্দেহ জীবনকে বিষাক্ত করেনি; যুক্ত জীবনের মন্দিরে ভালবাসার দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে তারা নিজেদের ধন্য করেছে। আর সেই শিশু? নিজেদের জীবন উদ্যানে সে-ফুল ফুটিয়েছে তাবা, দুজনের শ্রদ্ধায় সাধনায় যুক্ত হাতের নিষ্ঠায়। সেও কি পারতো না এমন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে, সে একনিষ্ঠ ভালবাসার শক্তি তো তার মধ্যেও ছিল, তবে কেন তার প্রেম এমন মিথ্যে হয়ে গেল? সন্দেহের কুয়াশা প্রেমের রৌদ্র দীপ্তিতে কেন বাষ্পের মতই মিলিয়ে গেল না?

জিন্ লিখেছে, তুমি একবার এসো ভাই, তোমাকে পাবার জন্যে বড় ব্যস্ত আছি।

অনেক দিন হয়ে গেছে সুরঙ্গমা ওখানে যায়নি, ব্যস্ত ছিল নিজের পড়াশোনা নিয়ে, ভাবলো—একবার মনটাকে একটু নাড়া দিয়ে আসবে, বড় এক চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে। জিনকে লিখলো, সে শীগগিরই আসছে।

সুরঙ্গমাকে পেয়ে জিন্ আর কৃষ্ণরাও দুজনেই খুব খুশী। জিন বললো—কৃষ্ণরাও তো এমনিতেই নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, ওর সঙ্গে কথা বলবার সময় পাওয়া ভার, তার ওপর ওর আরও একটা মস্ত বড় কাজ জুটে গেছে।

সুরঙ্গমা কৌতূহলী হয়ে কৃষ্ণরাওয়ের মুখের দিকে তাকায়, কৃষ্ণরাও কিছু না বলে একটু একটু হাসে। জিনকেই কথা বলবার অখণ্ড অবসর দেয়। জিন বলতে থাকে—আবার বল কেন, খুব

হৈ চৈ চলছে। পূর্ব-পশ্চিমের সম্মেলনের জন্যে একটা খুব বড় আয়োজন হয়েছে সেখানে ভারতীয়দের দিক থেকে ও একজন মস্ত বড় উদ্যোক্তা। ওর বন্ধুরা ওকে টেনে নিয়ে যায় হল্লা করে, তার মধ্যে আমার স্থান নেই। একটি কথা বলবার লোক পাই না, মনের দুঃখে আমি তোমার শরণ নিয়েছি!

সুরঙ্গমা হেসে বলে—তোমাব তো তাহলে বড় দুরবস্থা দেখছি, কৃষ্ণদা তোমায় একেবারে কোণ-ঠাসা করে ফেলেছে।

জিন্ এবার চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে—তা আমাদের সাহায্য ছাড়া ওদের কোন্ কাজটাই বা চলে বল? প্রকাণ্ড মেলা হবে, অনেক-গুলো স্টল খোলা হবে তার সবগুলোই প্রায় আমাদেব মেয়েদের অধিকারে। এটা হবে শহরের উপকণ্ঠে। তোমাকেও ভাই একটা স্টল-এ বসতে হবে, বলে রাখছি কিন্তু সুমি।

সুবঙ্গমা বলে—দূর, আমি কি ওসব বেচা-কেনা পারবো?

—তুমি দেখছি একটা ভারি বোকা মেয়ে! স্টলে বসে থাকবে, জিনিসগুলোর দরদাম শুধু বলে দেবে, সখের বেচা-কেনা সবাই কিছু-না-কিছু কিনবে, অন্ততঃ পক্ষে আলু কপি, এর মধ্যে না পাববার কি আছে বলতো?—জিন্ খিল খিল করে হেসে ওঠে।

কৃষ্ণরাও বসে বসে হাসছিল। জিন একটু বেশী কথা বলে, সবতাতেই উচ্ছ্বসিত হয়, ওর এই ছেলেমানুষীটুকু সে উপভোগ করে।

কৃষ্ণরাও জিনকে বলে—জানো এণা, সুমি খুব ভালো ভারতীয় বান্না জানে, ওর কাছে কিছু কিছু শিখে নাও না, বেশ মুখ বদলানো যাবে। ঝাল, ঝোল, চচ্চড়ি—আঃ জিভে জল এসে যায়। অবিশ্যি এগুলো বাংলা দেশের নিজস্ব রান্না, ওদের বাড়ীতে কতবার খেয়েছি!

ব্যগ্র হয়ে জিন্ বলে—আমাকে শিখিয়ে দাও ভাই সুমি, জানতো তোমার দাদাটি একটি খাদ্যরসিক, এদেশের রান্না ওর মুখে রোচে না। আমি তোমাদের দেশের রান্না শিখতে চাই।

সুরঙ্গমা হেসে ওঠে।—আচ্ছা কৃষ্ণদা, তুমি তো ভারতবর্ষ ছেড়েছ

আজ দশটি বছর, আর তো তারপর দেশে যাওনি, এত কথাও তোমার মনে আছে, কবে কি খেয়েছ তা আজও ভোলোনি?

কৃষ্ণরাওয়ের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের আরও অনেক কথা। সে একটু অন্যমনস্ক হয়।

সুরঙ্গমা বলে—সত্যি তোমাদের পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের ব্যাপারটা কি, আমায় একটু বুঝিয়ে দাও না কৃষ্ণদা!

কৃষ্ণরাও বলে—ব্যাপারটা খুব ইনটারেস্টিং, সব দেশের সব জাতির মধ্যে চেনা-পরিচয়, মন-দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার আর কি। কিছুকাল আগে আমাদের ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য দেশের সর্বসাধারণ যোগী-সন্ন্যাসী আর সাপ-বাঘের দেশ বলেই জানতো তাতো শুনেছ, কিন্তু দেশে দেশান্তরে আজ যে সংস্কৃতি বিনিময় চলেছে তার ফলে এদের চোখে আমরা আর বাঘ ভালুক নই, মানুষের পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়ে গেছি। অবশ্য গণ্ড গ্রামের কথা বলতে পারিনে কিন্তু শহর অঞ্চলের সুশিক্ষিত লোকেরা আজ প্রাচীন সভ্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতের শিল্পরীতিকে, দর্শনকে মর্যাদা দিচ্ছে এরা; আমাদের বহু প্রাচীন সভ্যতা ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের মনকে আকৃষ্ট করেছে, এরা আজ ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে চায়।

সুরঙ্গমা নিঃশব্দে শুনছিল, এবার প্রশ্ন করলো—এ কি শুধু ভারত আর ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ, অন্যান্য দেশ নেই?

—এ সর্বজাতি সমন্বয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয়ে মিলিত হতে আসছেন, এ হবে বিশ্ব-মানুষের তীর্থসঙ্গম। একজন মহাপ্রাণ ইংরেজ এই বিরাট সম্মেলনের উদ্যোক্তা। তাঁর নাম মিঃ মণ্টফোর্ড। আগে ইনি জুরিখ ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন এখন রিটায়ার করেছেন। অতি উদার মন, চমৎকার লোক, আমাকে খুব ভালবাসেন, আমার ওপর কাজের ভার দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত হন।

সুরঙ্গমা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছে, জিন্ কতক বুঝে কতক না-বুঝে কৃষ্ণরাওয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল, তার দিকে চোখ পড়তেই কৃষ্ণরাও হেসে বললো—আমার বাইরে বাইরে ঘোরাটাতে এণার ঘোর আপত্তি, ওর বেড়াবার সঙ্গী জোটে না তাই তোমার কথা মনে পড়েছে, নইলে তোমার কথা ওর একটুও মনে থাকে না।

—উঃ কি মিথ্যেবাদী তুমি। সুমি আমাকে ভালবাসে। তাই ও এলে আমার ভালো লাগে, তুমি শুধু শুধু আমার নামে—

ছেলেমানুষের মত জিনের চোখ জলে ভরে যায়। টুকটুকে তার গোলাপী গালে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত আদর করে তাকে শান্ত করে কৃষ্ণরাও, বলে—দেখেছ সুরঙ্গমা, পাকা আপেল টস্ টস্ করছে, এখুনি ফেটে যাবে।

সুরঙ্গমা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

॥ একুশ ॥

সঞ্জয় আর স্নিগ্ধার বাৎসরিক বিবাহ উৎসবে উপহার পাঠাবে বলে জিনকে সঙ্গে নিয়ে সুরঙ্গমা বেরিয়েছিল। সেণ্ট্রালে শহরের যত বড় বড় ফ্যাশনেবল্ দোকান। জিন্ তাকে নিয়ে এ দিককার সবচেয়ে বড় কো-অপারেটিভ শপ মিগ্রো-তে (Migros) ঢুকলো। জিন্ বললো—সুমি, ওপরে চল, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্ পরে মাথা ঠিক করে জিনিস কিনবে।

দুজনে ওপরে গিয়ে রেস্টুরেণ্টে বসলো। জিন্ অর্ডার দিল স্যাণ্ডউইচ আর কফির। খাওয়া হয়ে গেলে তারা নীচে নেমে এসে দোকানের এ-দিক ও-দিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। জিন্ বললো—কি কিন্‌বে, পোশাক-পরিচ্ছদ? ছবির অ্যালবাম? ফুলদানী?

সুরঙ্গমা বলে—দূর, ওসব কিছু নয়, নতুন কিছু বলো।

—সব জিনিস তো তোমায় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি পছন্দটা তো তুমিই করবে।

সুরঙ্গমা বলে—না, পছন্দটা তুমিই করো। দুজন খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো তারপর জিন্ কিনলো একটা 'কুক্কু ক্লক', বললো—এ জিনিসটা এখানকার বৈশিষ্ট্য, এ আর কোথাও পাবে না। প্রত্যেক ঘণ্টায় ক্লকের দরজা খুলে যায়, কুক্কু পাখীটা এসে সময় জানিয়ে দিয়ে যায়।

দোকানী জিনিসটা দেখিয়ে দিল, সুরঙ্গমা বললো—বাঃ কি চমৎকার!

দুজনে বেরিয়ে এল। সুরঙ্গমা বললো—কুক্কু আমাদের বসন্তেব পাখী, আমাদের দেশে এ পাখীকে কোকিল বলে। ফুল ফোটার সঙ্গে এ পাখীর ডাক শোনা যায়, ভারি মিষ্টি। এর পাশে এক গোছা ফুল সাজিয়ে রাখলে চমৎকার দেখাবে।

—কি ফুল রাখা হবে এর পাশে ? জিরেনিয়াম, ক্রীসেনথেমাম ? তোমাদের ভারতবর্ষের কোন ফুলের নাম তো আমি জানিনে।

—না, কোন সুগন্ধি ফুল, যেমন রজনীগন্ধা। শুভ্র সুন্দর, সন্ধ্যেবেলা ফোটে সারারাত গন্ধে মাতিয়ে রাখে। ভারি মিষ্টি গন্ধ তাই ওর নাম রজনীগন্ধা।

জিন্ রজনীগন্ধা উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হল। বললো—তুমিও ওই ফুলটার মত গন্ধে ভরপুর কিন্তু আমি যে ও নামটা উচ্চারণ করতে পারিনে!

সুরঙ্গমা হাসে। জিন্ সুরঙ্গমার নামটাও উচ্চারণ করতে পারে না, কোনমতেই আয়ত্ত করতে না পেরে সংক্ষিপ্ত করে সুমি বলে ডাকে।

দোকান থেকে বেরিয়ে জিন্ সুরঙ্গমাকে বললো—সুমি, এবার তুমি একাই চলে যাও, আমি পিয়ানোর লেস্ন নিতে যাচ্ছি।

জিন্ চলে গেলে সুরঙ্গমা পঁ দ্যু-মঁব্লাঁ। (Pont du Mont Blanc)

ব্রিজের ওপর উঠে হাঁটতে লাগলো। খানিকদূর যেতেই তার মনে হল কে যেন তাকে পেছন থেকে ডাকছে—এ মাদ্‌মোয়াজেল।

সুরঙ্গমা ফিরে চাইলো, দেখে একদল যুবক, দেখে মনে হয় ইতালীয়ান্, ওর পেছন পেছন আসছে। ছেলেগুলোর পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন, ভাবভঙ্গিও অভদ্রজনোচিত। সে ব্রিজের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। একটি ছেলে, হাতে তার ক্যামেরা, বললো—তোমার ছবি তুলবো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করলো—কেন?

ওদের একজন বললো—তুমি সুন্দরী, তাই। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মেয়েদের আমরা খুব পছন্দ করি, তাদের বান্ধবী পেলে আমরা খুব খুশী হই।

ছেলেটির কথাবার্তার অশ্লীল ধরন দেখে সুরঙ্গমা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ভ্রূভঙ্গি করে দৃঢ়স্বরে বললো—না। ধন্যবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো। তবু ওরা নিবস্ত হয় না, ওর কালো চুল, কালো চোখ আর শাড়ী পরার সুন্দর ভঙ্গির কথা শোনায় আর সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকে। সুরঙ্গমা আর কোন জবাব দেয় না, ব্রিজের ওপর দিয়ে সোজা স্টেশনের দিকে দ্রুত পা চালায়। ছেলেগুলো এবার থেমে যায়, দূর থেকে ছুঁড়ে-দেওয়া তাদের অশ্লীল মন্তব্য আর শ্লেষের হাসিতে সুরঙ্গমার দুই কান গরম হয়ে ওঠে।

সাধারণতঃ ওদেশের ব্যস্ত মানুষরা এ সব ছোটখাট বিষয়ে নজর দেয় না কিন্তু ব্রিজের অন্যপ্রান্তে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একটি ভারতীয় ছেলে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। তার মধ্যে প্রতিবাদ করবার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগেছিল কিন্তু অচেনা মেয়েটি এই গায়ে-পড়ে উপকারের চেষ্টাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে তা সে বুঝতে পারছিল না তাই অগ্রসর হবার সাহস পায়নি।

ছেলেটি এই দিকেই কোথায় থাকে, মাঝে মাঝে ব্রিজের দিকে

বেড়াতে আসে। এরপর আবার যেদিন অধ্যবসায়ী সেই ইতালীয়ান যুবকের দলটিকে ঐ মেয়েটিকে উত্যক্ত করতে দেখা গেল তখন আর সে ধৈর্য ধরতে পারলো না, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলো—কি চাও তোমরা? কেন এঁকে বিরক্ত করছো?

ছেলেগুলো ওর দিকে চাইলো তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো—পুর্কোয়া এস্‌ক ভু ভু মেলে দ্যনো জাফ্যার? এস্‌ক মাদ্‌-মোয়াজেল এ ভোতর্‌ ফিয়ঁসে? (কেন আপনি আমাদের ব্যাপারে নিজেকে জড়াচ্ছেন? শ্রীমতী কি আপনার বাগ্‌দত্তা?)

এগিয়ে এসে ছেলেটি দৃঢ়স্বরে বললো—আমি ওঁর স্বদেশবাসী তাই এসেছি, ওঁকে অপমান করবার তোমাদের কোন অধিকার নেই।

একটা ছেলে মারমুখো হয়ে আস্তিন গোটাচ্ছিল কিন্তু ভারতীয় ছেলেটি ক্ষিপ্রহাতে ওর ঘুষিটা ধরে ফেললো। মেয়েটিকে নিযে কোন পুলিসী হাঙ্গামা হয় তা তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। অবশ্য দুই চারজন লোক দাঁড়িয়ে যেতে দেখে পুলিসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার আগেই ছেলেগুলো রণে ভঙ্গ দিল।

সুরঙ্গমা নির্বাক হয়ে আকস্মিক ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল, ছেলেটি তার দিকে ফিরে অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে—আপনি এবারে বাড়ী চলে যান, আর যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি, আপনি আর একা এদিকে আসবেন না।

ছেলেটি আস্তে আস্তে ব্রিজের ওপর দিয়ে বিপরীত দিকে ফিরে চললো, সুরঙ্গমাও তার পথ ধরলো।

ঘটনার বিবরণ আর ভারতীয় ছেলেটির বর্ণনা শুনে জিন্‌ বললো—আমার মনে হচ্ছে ছেলেটি অরিন। ও ওই দিকেই থাকে শুনেছি। তা যাই হোক, বদ্‌ ছোঁড়াগুলো যখন তোমার পেছনে লেগেছে তখন তোমার আর একা ওদিকে গিয়ে দরকার নেই। ওরা ভারি খারাপ, ভারতীয় মেয়েদের ওপরে ওদের ভারি লোভ।

অরিন্দম নামে যে ছেলেটি জেনেভাতে ইণ্ডিয়ান কন্‌স্যুলেটে চাকুরী করে কৃষ্ণরাওয়ের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, জিনের সঙ্গেও আলাপ আছে তার, ওর পুরো নাম উচ্চারণ করতে পারে না বলে জিন্‌ ওকে অরিন বলে। কৃষ্ণরাও বলে—তুমি তোমার ইচ্ছামত সকলের নামকরণ করবে এতো ভারি জুলুম।

জিন্‌ হেসে উঠে বলে—তুমি যে আমার নাম একেবারে পাল্টে দিয়েছ, এনাক্‌-এনাক্‌স্‌মি ও নামটাও তো আমার মুখে আসে না।

কৃষ্ণরাও আদর করে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে—তোমার নাম এণা, কেমন মিষ্টি আর সহজ নাম বলতো ?

জিন্‌ পরিতৃপ্তির হাসি হাসে।

লণ্ডনে সুরঙ্গমা 'ওয়েস্ট মিড্‌ল্‌সেক্স' হাসপাতালে শিশু চিকিৎসা বিভাগে যোগ দিয়েছে, ভারতে অসমাপ্ত চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধেও পড়াশোনা করতে হয়। সময় কম কাজ অনেক বেশী তবু এর মধ্যে সময় করে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে সে সঞ্জয় আর স্নিগ্ধাকে চিঠি লেখে। সঞ্জয়কে লেখে পড়াশোনার সম্বন্ধে আর স্নিগ্ধাকে তার লণ্ডন জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ; যা কিছু দেখে, যেখানে বেড়াতে যায়, সব বর্ণনা দিয়ে চিঠিতে জানায়। সেদিনকার ঘটনা, জেনেভাতে পঁ ত্যু মঁব্লাঁ ব্রিজের ওপর যা ঘটেছিল সে সব কথা লিখে পরে লিখেছে—ওই ভারতীয় ছেলেটি বাঙ্গালী। ভারি ভালো লোক, ওঁর চেষ্টাতেই ব্যাপারটা গুরুতর হতে পারেনি। জিনের মুখে শুনেছি, কৃষ্ণদার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান কনস্যুলেটে কাজ করেন, ওঁদের পরিচিত।

মিঃ মণ্টফোর্ডের নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড নেশানস্‌ প্যালেস্‌'-এ নানাদেশের প্রতিনিধিগণের এক বিরাট সম্মেলন হয়। পরদিন শহরের উপকণ্ঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে। অনেক লোক সেখানে মিলিত

হয়েছে, নানারকম জিনিসের দোকান বসেছে, হাসি গল্প আনন্দ উৎসবে মেলার ক্ষেত্র মুখরিত।

জিনের একান্ত অনুরোধে সুরঙ্গমাকে আবার জেনেভাতে আসতে হল। ওর অসুবিধে হবে পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে কৃষ্ণরাও জিন্‌কে বারণ করেছিল কিন্তু জিন্ অত্যন্ত দুঃখিত হয়, ক্ষুণ্ণ হয় দেখে জোর করতে পারেনি।

জিন্ আর সুরঙ্গমা পাশাপাশি দুটো স্টল নিয়েছে। দুজনে গল্প করছিল হঠাৎ একটু দূরে অরিন্দমকে দেখতে পেয়ে জিন্ হাতের ইশারায় ওকে ডাকলো। অরিন্দম চেনা লোককে দেখতে পেয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, পর মুহূর্তেই অবাক চোখে সুরঙ্গমার দিকে চায়। এ তো সেই মেয়েটি সেদিন যাকে ও ব্রিজের ওপর দেখেছিল! বিস্মিত দৃষ্টি একটু পরেই ও ফিরিয়ে নেয়, পরিচয় তো নেই!

জিন্ হেসে বলে—এসো পরিচয় করিয়ে দি, এ আমার বন্ধু সুমি আর উনি কৃষ্ণরাও এর বন্ধু অবিন মুখারজি।

অরিন্দম হাত তুলে নমস্কার করে, সুরঙ্গমাও প্রতিনমস্কার জানায়।

জিন্ বলে—অরিন, তুমি অনেকদিন আমাদের ওখানে আসছ না, এবারে আসবে। সুমি দু'তিন দিন আমাদের কাছে থাকবে, এলে ওর সঙ্গেও দেখা হবে। লণ্ডনে ও বেচারী বড় একলা পড়ে গেছে, ওর দেশের পরিচিত যাঁরা আছেন তাঁরা অনেক দূরে দূরে থাকেন তবে এইটুকু সুবিধে যে, ও আমাদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ একটি ভারতীয় পরিবারেই থাকে।

জিন্ কথা বলতে পেলে থামতে চায় না, আবার বলে—আসছ তো অরিন, ভয় নেই সুমি ভারি ভালো মেয়ে আঁচড়াতে কামড়াতে মোটেই জানে না।

জিন্ খিল খিল করে হেসে উঠে। সুরঙ্গমা অপ্রতিভ হয়ে মাথা নীচু করে, অরিন্দমও।

কৃষ্ণরাও-এর ওখানে অরিন্দম আসে। মেয়েটিকে ভালো লেগেছে তার, বাংলাদেশের নরম প্রকৃতির মেয়ে। জিন্ সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কৃষ্ণরাও আর সুরঙ্গমা গল্প করে। অরিন্দমও ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। তিন চার দিন পরে সুরঙ্গমা যখন লণ্ডনে চলে যায় বাড়ীটা ফাঁকা লাগে সকলেরই, এমন কি অরিন্দমেরও।

॥ বাইশ ॥

বাঁশের জাফরির ফাঁক দিয়ে সকাল বেলাকার কোমল রোদ বিচিত্র হয়ে বারান্দার মেঝেতে পড়ে ঝিলমিল করছিল। জাফরির গায়ে কুঞ্জলতার ঝাড়, লাল লাল ফুলগুলো তারার মত ফুটে রয়েছে, লতাগুলো বাতাসে দুলছে, তার ছায়া বারান্দার ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। একখানা হালকা বেতের চেয়ারে অমিতা বসেছিল। জীবনের অতীত আর বর্তমান চিন্তায় একাকার হয়ে গিয়ে কেমন একটা উদ্দেশ্যহীন বিষণ্ণতায় তার মনকে ভরে দিয়েছিল। সে বুঝতে পারে না কি চায় সে, জীবনের কাছে কিসের আকাঙ্ক্ষা তার? যা হাতের কাছে এসেছিল তার সুযোগ তো সে নেয়নি, ইচ্ছে করে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, তার জন্যে কি দুঃখ হয়? বোধহয় না। অনেক দিনের অভ্যস্ত চিন্তা মনের যে বশ্যতা এনেছিল সেই ভাবনাটা থেকে মন মুক্ত হয়েছে তাই বোধহয় জীবনটা এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নতুন করে ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে, কিন্তু সে কোন্ পথে? কি করবে সে সামনের জীবনে, পড়াশোনা? শিক্ষকতা? কোনটাতেই মন সায় দেয় না। বিভ্রান্ত মন যেন পথ খুঁজে পায় না। ইঁটচাপা ঘাসের মতো মনের রং যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে, কতদিনে তার সতেজ সবুজ স্বাস্থ্য সে ফিরে পাবে? অমিতার এত মনের বল কোথায় গেল, কিসের অবসাদ তার মনকে এমন ঘিরে ধরেছে, নিজের

স্বাতন্ত্র্যের জোরে সে তো নিজেই সম্পূর্ণ ছিল। না, এ অবসাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, মনের জোরে একে ঝেড়ে ফেলতে হবে, সুরঙ্গমার মত কোমল নয় সে, সে শক্ত ধাতুতে গড়া।

সুরঙ্গমার কথা ভাবে। সরলমনা শান্ত মেয়ে, ভালমন্দ বিচার করে বেছে নেবার মত শক্তি তার নেই। ঘটনার স্রোতে ভেসে যায় আত্মরক্ষা করতে পারে না এম্‌নি ও অসহায়, পড়াশোনা শেষ না হতেই জীবনের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল। কিন্তু বন্ধনই ও চেয়েছিল, একলা পথ চলতে পারে না, নির্ভর করাতেই ওর আনন্দ আর স্বস্তি। সুখী হয়েছে ও, ওর বড় সৌভাগ্য ভুল করে অপাত্রে আত্মদান করেনি, ও যাকে ভালবেসেছিল যোগ্য পাত্র সে। শুভেন্দুদার মত যোগ্য পাত্র কয়জন আছে?

নিজেকে বিচার করতে বসে অমিতা। সে কি অনিন্দ্যকে অমনি করে ভালবাসতে পেরেছিল? সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে আত্মসমর্পণ করেছিল সুরঙ্গমার মত? না, পারেনি, তার স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাকে বাধা দিয়েছিল। এক সময়ে সে ভেবেছিল সে যার বাগ্‌দত্তা তাকে ভালবাসাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু সে বুঝতে পারেনি এ ছিল তার মস্ত বড় ভুল, এ ছিল ভালবাসা-ভালবাসা খেলা, মনের গভীরে তা শিকড় গাড়তে পারেনি, তা যদি হত তবে অনিন্দ্যের অভাবে, অনিন্দ্যকে ছাড়তে তার জীবনের মূলসুদ্ধ উপড়ে জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত কিন্তু তা তো যায়নি। তবে কি সত্যিকারের ভালবাসার সঙ্গে তার আজও পরিচয় ঘটেনি? যে-প্রেম সমস্ত সত্তাকে তোলপাড় করে উদ্দাম ঝড়ের মত সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে সব বিচার বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়, জীবনে তার স্বাদ ও পেলো কোথায়? তাকে নিয়ে এ পরিহাসের, তার জীবনকে নিয়ে এ মিথ্যে খেলা খেলবার জীবনবিধাতার কি প্রয়োজন ছিল? বঞ্চনার দুঃখে ওর দুই চোখ জলে ভরে যায়।

হঠাৎ এক সময় অমিতা মুখ তুলে দেখে সামনে কুশল দাঁড়িয়ে,

যেন কতকটা বিব্রত। প্রসন্ন হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অমিতার, চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি! বসুন।

কুশল বলে—আমি ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, তিনি বাড়ীতে নেই বুঝি?

অমিতা বললো—না বাবা রবিবার সকালে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোন।

—আপনি কেমন আছেন, বেশ ভালো হয়ে গেছেন তো? চেহারাটা তেমন ভাল মনে হচ্ছে না যেন!

কুশল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অমিতার মুখের দিকে চেয়ে আছে, অমিতা মুখ তুলেই একটু লাল হয়ে উঠলো, মুখ নামিয়ে বললো—তবু ভালো, আমার সম্বন্ধেও একটু আধটু ভাবেন।

কুশল হঠাৎ বলে বসলো—ভাবি অনেক সময়েই আপনাকে, আসতেও ইচ্ছে হয় কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর—

—ভাবেন? সত্যি আমার জন্যেও এখানে আসতে আপনার ইচ্ছে হয়?

অমিতার আবেগ-ভরা কণ্ঠ কুশলকে বিস্মিত করে, ও অমিতার প্রত্যাশাপন্ন চোখে চোখ রেখে বলে—সত্যি ইচ্ছে হয় কিন্তু বেশী এলে আপনি পাছে কিছু মনে করেন, পাছে বিরক্ত হন সেই ভয়ে—

অমিতা আকুল স্বরে বলে ওঠে—আমি কিছুই মনে করিনে, একটুও বিরক্ত হইনে, আপনি কেন বুঝতে পারেন না যে, আপনি এলে আমার ভালো লাগে!

হঠাৎ অমিতা উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়, কুশল স্বপ্নমুগ্ধের মত বসে থাকে। কতক্ষণ থাকে তা বুঝতে পারে না; এক সময় ডঃ রায়ের গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়—এই যে কুশল এসেছো, কতক্ষণ একলা বসে আছ, তোমায় ওরা দেখতে পায়নি বুঝি?

কুশল থতমত খেয়ে যায়, বলে—আজ্ঞে না, এতক্ষণ অমিতা দেবী এইখানেই ছিলেন এইমাত্র ঘরের মধ্যে গেলেন।

—বেবি, কোথায় গেলি তুই ?

অমিতা ঘরের মধ্যে থেকে জবাব দেয়—যাই বাবা। সলজ্জভাবে অমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, ডঃ রায় তার দিকে একনজর চেয়ে দেখে তারপর বলেন—কুশলকে চা দিস্‌নি বুঝি ? যা, চা নিয়ে আয়, ওর অনারে আমার জন্যেও এক কাপ—

অমিতা বলে—সে বুঝতে পেরেছি বাবা।

কুশল মাঝে মাঝেই আসে, সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে উঠেছে, এখন সহজ ভাবেই কথা বলে।

সেদিন অমিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল বাইরে কুশলের গলার আওয়াজ পেয়ে চকিত হল।

ধরিত্রী দেবী বলছিলেন—এসো বাবা কুশল, বোসো, অনেক দিন পরে এলে !

কুশল জবাব দেয়—আমার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই কিছুদিন বাড়ী থেকে বেরোইনি, এখন মা ভাল আছেন।

ধরিত্রী দেবী হাসিমুখে বলেন—এখন বাপু তোমার বিয়ে থা করার দরকার, মার অসুখ-বিশুখ করলে দেখতে পারবে, তোমার বাড়ীতে তো নিজের লোক আর কেউ নেই ?

কুশল কিছু না বলে মাথা নীচু করে থাকে। ধরিত্রী দেবী অমিতাকে ডাকেন—অমি, কুশল এসেছে।

অমিতা বেরিয়ে আসে, মা তাঁর কাজে যান। অমিতার চুলবাঁধা সম্পূর্ণ হয়নি, কোন রকমে হাতখোঁপা জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ছোট ছোট কোঁকড়া চুলগুলো ওর মুখখানিকে ঘিরে আছে, কুশল ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে ও মুখ নীচু করলো।

কুশল বললো—আমি অনেকদিন আসতে পারিনি মার অসুখে ব্যস্ত ছিলাম, রাগ করেন নি তো ?

—আচ্ছা, আপনি আমায় কি ভাবেন বলুন তো ? মাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাতে আমি রাগ করবো ?

—না, না, আমি ঠিক ও কথাটা বলতে চাইনি, আমি—

হেসে ফেলে অমিতা বলে—থাক ও কথা। আমি মাকে দেখতে যাব।

সাগ্রহে কুশল বলে—যাবেন? মা তা হলে ভারি খুশী হবেন, কত যে বলেন আপনার কথা।

অমিতা অবাক হয়ে বলে—মা তো আমায় কখনো দেখেননি?

দেখেছেন বইকি, সেই যে একদিন আপনি আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন উৎসবের প্রোগ্রাম নিয়ে, আর তা ছাড়া মা জানেন যে, আমি মাঝে মাঝে আপনাদের বাড়ীতে আসি, ফিরে গেলে আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন।

অমিতা আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি তো অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম, আজও তিনি আমায় মনে রেখেছেন এ আমার সৌভাগ্য।

কুশল হাসিমুখে বলে—আমার মা লোককে ভারি ভালবাসতে পারেন, চিরদিন সকলকে ভালবেসে সেবা করে জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু নিজে কারু সেবা নেননি। এই তো সেদিন অতবড় অসুখের পর যেদিন পথ্য করলেন নিজের হাতেই তাঁকে রান্না করে নিতে হল।

অমিতা ব্যথিত হয়ে বললো—নিজেই করতে হল? আপনি কেন—

—কি করব বলুন, মা যে কারু হাতে খান না আর তা ছাড়া আমি তো ওসব জানিনে।

—আচ্ছা আমি যদি রান্না করে দি উনি কি খেতে রাজী হবেন?

কুশল বললো—না, কুমারী মেয়ের হাতে মা খান না। শুনেছি অশক্ত হলে ছেলে আর পুত্রবধূর হাতেই খাওয়া চলে কিন্তু—

হঠাৎ দুজনের চোখাচোখি হয়ে যেতেই বিব্রত হয়ে কুশল থেমে গেল, দুজনেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মাত্রার অতিরিক্ত কথা বলে ফেলে কুশল এবার অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

বাইরে কম্পাউণ্ড-এ ডঃ রায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, বারান্দায় উঠে ডাকলেন—বেবি, বেবি।

—এই যে বাবা।—অমিতা দৌড়ে বেরিয়ে এল।

—গাড়ী রাখতে বলেছি, তোর না কোথায় যাবার কথা ছিল।

—না বাবা, আমি আজ কোথাও যাব না, গাড়ী তুলতে বল।

কুশল সামনে আসতেই ডঃ রায় খুশী হয়ে বল্লেন—কুশল যে, এসো এসো।

অমিতা বলে—বাবা, ওঁর মার খুব অসুখ করেছিল, কাল সকালে আমি আর তুমি তাঁকে দেখতে যাব।

ডঃ রায় উৎসাহিত হয়ে বলেন—এটা খুব ভালো কথা ভেবেছিস্ বেবি, নিশ্চয়ই যাব।

পরদিন এঁদের দেখে জাহ্নবী দেবী অত্যন্ত খুশী হলেন, কুশলেব মুখে শুনেছিলেন।

ডঃ রায়ের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হবার পরে অমিতা তাঁর পায়ের কাছে নত হতেই দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তুলে জাহ্নবী দেবী বললেন—আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগে, ভারি লক্ষ্মী মেয়ে আপনার রায় মশাই।

ডঃ রায় হাসতে হাসতে বললেন—সে বিষয়ে আমার নিজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তবে আমার মেয়েকে আমার তো ভালো লাগবেই, আপনারও যে ভালো লেগেছে সেইটেই ওর গৌরব।

কুশলের সঙ্গে অতর্কিতে অমিতার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়, কুশল সসঙ্কোচে চোখ নামিয়ে নেয়।

অমিতার স্বাস্থ্যের লাবণ্য আবার ফিরে এসেছে, ঝর্ণার কলধ্বনির মত সেই উচ্ছল হাসির শব্দ যেন আবার শোনা যায়। ওর হাসির আওয়াজ পেলেই ডঃ রায় কান পাতেন তারপর ধরিত্রী দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন।

॥ তেইশ ॥

শুভেন্দু জেনারেল ওয়ার্ডে রোগীদের দেখতে দেখতে যায়। পাল্‌স্‌ দেখে, জ্বরের চার্ট দেখে, ওয়ার্ড নার্সকে দু'একটা প্রশ্ন করে। চলতে চলতে একটা বেডের সামনে শুভেন্দু থমকে দাঁড়ায়, এক-মিনিটের জন্যে তার মুখখানা কেমন বিবর্ণ দেখায় তারপর আস্তে আস্তে রোগীর হাতখানা সন্তর্পণে সে হাতের মধ্যে তুলে নেয়। রোগী চোখ মেলে চায়, প্রবল জ্বরে আরক্ত চোখ খুলে শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়েই সে দুই চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে ওঠে—কে, কে, কে তুমি ?

রোগী ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এত জ্বরের ওপর এতখানি উত্তেজনা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি টলখানা টেনে নিয়ে ওর পাশে বসে পড়লো, ওর কপালে হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললো—ভয় নেই, ভয় নেই হারীত।

হারীত দু'হাতে ওর হাতখানা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলো, প্রবল জ্বরের উত্তাপে তপ্ত হাত দুখানা শুভেন্দুর হাতখানাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, শুভেন্দু শান্ত হয়ে বসে রইলো। হারীত চোখ বুজে কয়েক মিনিট দম নিল, তারপর চোখ খুলে আর্তস্বরে বলে উঠলো—প্রতিশোধ নিও না শুভেন্দু আমায় বাঁচাও, বাঁচাও শুভেন্দু।

আস্তে আস্তে ওর হাতের মধ্যে থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে শুভেন্দু আবার ওর মাথায় হাত রাখলো, কানের কাছে মুখ নিয়ে আশ্বাসের সুরে বললো—তুমি শান্ত হও, কোন ভয় নেই তোমার, আমি ডাক্তার, হারীত।

আশ্বাস পেয়ে রোগী আবার চোখ বুজলো। মনে হয় যেন উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে আতঙ্কিত মুখের চেহারা আস্তে আস্তে

স্বাভাবিক হয়ে আস্‌ছে। শুভেন্দু ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে, কয়েক মিনিট পরে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আবার ও ঘুমিয়ে পড়লো। শুভেন্দু নিঃশব্দে উঠে গেল।

অচিন্তিত এই ঘটনায় শুভেন্দুর মনটা ধাক্কা খেয়ে বিকল হয়ে যায়, প্রাণপণে সে তার অভ্যস্ত সংযমকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। না, তার তো ধৈর্য হারালে চলবে না, সে যে ডাক্তার। রোগী শত্রু হোক্ মিত্র হোক্ পাপী হোক্ পুণ্যবান হোক্ সে রোগী—ডাক্তারের কাছে এই একমাত্র তার পরিচয়। তাকে সুস্থ করবার জন্যে ডাক্তারের সব চেষ্টা সকল শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে, এখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্থান নেই।

শুভেন্দু চেষ্টা করে হারীতকে একটা কেবিনে ভর্তি করলো। দিনরাত্রির জন্যে দুজন নার্স নিযুক্ত করলো। লিভারে অ্যাবসেস্ হয়েছিল, যন্ত্রণায় সে যখন চিৎকার করে শুভেন্দু তার কপালে হাত রাখে। বিগত দিনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পরিণাম তাকে যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাতে শুভেন্দুর করুণা হয়। মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে রোগী প্রলাপ বকে, কখনো সুরঙ্গমার নাম উচ্চারণ করে। তাকে উদ্দেশ করে বলে, কত ভালো তুমি, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি।

চোখ বুজে আপন মনে বিড়বিড় করে হারীত, রোগীর রোগের অবস্থা নির্ণয়ের জন্যে ওর মুখের কথায় কান পাতে শুভেন্দু। হারীত নিজের মনেই বলতে থাকে, অপরাজিতা তুমি, জোর করে জড়িয়ে ধরেছিলাম তাই কি অপমানে নীল হয়ে গেলে? মাপ করো সুরঙ্গমা তুমি এত ভালো তা বুঝতে পারিনি।

শুভেন্দুর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ঝড় উঠেছে, প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে সব কিছু ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে, বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে শুভেন্দুর। আত্মবিস্মৃতের মত সে জোরে হারীতের হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। হারীত আরক্ত চোখ মেলে চায়, কষ্টে

বিকৃত হাসি হেসে বলে—প্রলাপ বক্‌ছিলাম না শুভেন্দু? না প্রলাপ নয়, মিথ্যে নয়, সত্যি কথাই বলছিলাম, কন্‌ফেসান। তুমি আমার বিচারক তোমার কাছে পাপ স্বীকার না করলে আমার শান্তি নেই। আমিই দোষী, সুরঙ্গমার কোন অপরাধ নেই, বিশ্বাস করো শুভেন্দু।

হারীতের চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, শুভেন্দুর হাতের মুঠি আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যায়।

এর পরদিন শুভেন্দু এলে হারীত বললো—শুভেন্দু, সিস্‌টারকে একটু বাইরে যেতে বল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সেবিকা বাইরে গেলে হারীত বললো—আমাকে একটু তুলে বসিয়ে দাও, আমি আজ ভালো আছি শুভেন্দু।

সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বলে—উঠে বসাটা তোমার পক্ষে উচিত হবে বলে মনে হয় না।

অনুনয়ের স্বরে হারীত বলে—একটিবার শুভেন্দু। জানি আমি বাঁচব না, বাইরের আকাশটা একবার চোখ ভরে দেখতে দাও, আমার মাথার কাছের জানলাটা ভাল করে খুলে দাও আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—জানলাটা তো খোলাই রয়েছে হারীত।

—কই? তবে আমাকে একবার বসিয়ে দাও।

শুভেন্দু ইতস্ততঃ করতে থাকে। হারীত এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে, নিজেই ওঠবার চেষ্টা করে। নিরুপায় শুভেন্দু তখন অতি সাবধানে তাকে তুলে বসায়, পিঠের কাছে বালিস দিয়ে দেয়। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে হারীত বলে—বাঁচালে শুভেন্দু, আঃ! শুয়ে থেকে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না।

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলে—শুভেন্দু, তুমি জানো আমি জীবনকে বড় ভালো বেসেছিলাম, এক সময়ে মানুষকে ভালবেসে নিজেকে বাইরের জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, বাইরের সব আনন্দ

লুঠ করে নিতে চেয়েছিলাম তাই পাঠ্য জীবনের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে গেলাম। কিন্তু আমি তো লোক খারাপ ছিলাম না শুভেন্দু!

শুভেন্দু উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে। হারীত বলতে থাকে—তুমি জানো আমি ফেল করে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি জানো না কি ভয়ানক অর্থ কষ্টে পড়ে আমার বিধবা মা আমাকে আর পড়াতে পারেননি, এমন কি খাওয়ার সঙ্গতিও তখন আমাদের ছিল না। নিরুপায় হয়ে কলকাতায় এসে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে চাকুরীর চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু—শুভেন্দু বাধা দিল—এখন এসব কথা কেন হারীত, আজ তোমার জ্বরটা একটু কম আছে, অত কথা বললে আবার বেড়ে যাবে।

—আমায় বাধা দিও না শুভেন্দু, আমার যে-দুঃখ অন্ধকারে মাথা কুটে মরছে তাকে বাইরের আলোতে আসতে দাও।

—আমি আনন্দবাদী ছিলাম দুঃখকে কখনও আমল দিতে চাই-নি, কিন্তু দিনের পর দিন যখন জীবনের ব্যর্থতায় পিষ্ট হতে থাকলাম তখন জীবনের ওপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম, আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি এল কিন্তু তারপর এক সময়ে কেমন করে জানি না মনের গতি ফিরে গেল, আমি ভয়ানক সিনিক হয়ে উঠলাম। দুনিয়ার ওপর আক্রোশ জন্মালো সুখী লোকদের হিংসে করতে লাগলাম—ধনীদের ঘৃণা করতে লাগলাম, স্নেহ মমতা দয়া এই সব সুকুমার বৃত্তিগুলো মন থেকে একেবারে মুছে গেল। এই সময়ে সস্তা আনন্দ খুঁজতে গিয়ে কুসঙ্গে পড়ে নীচে নেমে গেলাম। হারীত হাঁফাতে লাগলো।

শুভেন্দু ব্যাকুল হয়ে বললো—হারীত, এবারে তুমি চুপ করো, এখন তো ওসব কথা বলবার সময় নয়, বিশ্রাম করো, এবারে শোও হারীত।

চোখ বুঝে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে তারপর এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিল হারীত, তারপর বললো—আমাকে বারণ করো না শুভেন্দু, আমি জানি আর আমার

বলবার সময় হবে না। আর দু-একটি কথা আমার বলবার আছে আমায় বলতে দাও। জীবনের হাতে অনেক গলাধাক্কা খেয়ে অনেক অপমান সয়ে আমি চোর হতে চাইলাম।

শুভেন্দু চম্‌কে উঠলো—চোর?

—হ্যাঁ শুভেন্দু, চোর। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সে সাধু-সংকল্প সফল হতে পারেনি।

বিকৃত কণ্ঠে হেসে উঠলো হারীত। শুভেন্দু ভয় পেয়ে বিস্ফারিত চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে তারপর হাত ধরে ওকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলো, অনুনয় করে বললো—এবার শুয়ে পড় হারীত, তুমি অনেক বেশী কথা বলেছ, তোমাকে এত কথা বলতে দেওয়া ডাক্তারের দিক থেকে আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে যাচ্ছে এতে তোমার অসুখ বেড়ে যেতে পারে।

হারীত বোধহয় শুভেন্দুর কথা শুনতে পেল না, জোর করে শুভেন্দুর হাত দুটো ঠেলে দিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললো—আমার সে সাধুসংকল্পে কে বাধা দিল জানো শুভেন্দু, সে একটা মেয়ে।

শুভেন্দু বিপন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলো, হারীত নিজের খেয়ালে বলে যেতে লাগলো—আমাদের সেই জীর্ণ ভাড়া বাড়ীটার পাশেই বড়লোকের একটা ঝক্‌ঝকে তেতলা বাড়ী ছিল, একদিন পাইপ বেয়ে সেই তেতলায় উঠলাম। একটা ঘরের থেকে নীল আলো দেখা যাচ্ছিল, দরজা খোলা পেয়ে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকলাম। শুভেন্দু, কি দেখলাম জানো? দৈত্যপুরীর মধ্যে সেই রূপকথার রাজকন্যা। কিশোর লাবণ্যে ঢল ঢল মুখখানি, এলোমেলো বেশ রূপবতী এক রাজকুমারী গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে তার নিশ্চিন্ত বুকখানা আস্তে আস্তে ওঠা পড়া করছে। গলায় তার দামী গয়না ছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম কিন্তু ছুঁতে পারলাম না, নিঃশব্দে সেই পাইপ বেয়ে নীচে নেমে এলাম। আমি চোর হতে কিছুতেই পারলাম না।

বালিশের গায়ে মাথা রেখে হারীত এবার যেন ঘুমিয়ে পড়লো। শঙ্কিত শুভেন্দু নিঃশব্দে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ কাটলে হারীত হঠাৎ চোখ মেলে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো—কিন্তু আমার শেষ কথা যে বলা হল না। সুরঙ্গমা, সুরঙ্গমাকে আমি ভালবেসেছিলাম, কিন্তু জানতাম আমার পক্ষে সে দুর্লভা, তাকে পাবাব জন্যে তাই অন্যায় পথ অবলম্বন করলাম। আয়ত্তে আনবার জন্যে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলাম, প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। শুধু একবার একটুখানি ভুল সে কবেছিল—সে ভুল তার ঐ চিঠি। কিন্তু শুধু এইটুকুই ভুল। এর পর আর কিছু নেই। শুভেন্দু, খবর নিয়ে জেনেছি সুরঙ্গমা তোমাব কাছে নেই দূরে চলে গেছে, ওকে ফিরিয়ে এনো শুভেন্দু, আর যদি পারো আমাকে ক্ষমা করো।

হারীতের ঠোঁট নীল হয়ে গেছে, হঠাৎ তার মুখের দুই কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝুলে পড়লো। সন্ত্রস্ত শুভেন্দু তাড়াতাড়ি দুহাতে জড়িয়ে ওকে শুইয়ে দিল তারপর পালস্ দেখবাব জন্যে ওর হাতখানি হাতে তুলে নিল।

অপারেশন হল। হাসপাতালের অভিজ্ঞ সার্জন অপারেশন করলেন কিন্তু রোগীকে বাঁচানো গেল না। লিভারের অবস্থা চরমে এসে পৌঁছেছিল, রোগীর প্রাণশক্তিও, শুভেন্দু তার সকল সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করেও হারীতকে বাঁচাতে পারলো না।

॥ চব্বিশ ॥

দিন আর রাত্রি একার্থক, কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন মতে কেটে যায়। যন্ত্রেব মত কাজ করে যন্ত্রের মত চলাফেরা করে, অনুতাপের আগুন ভেতরটাকে অহরহ পোড়ায়। শুভেন্দু যে হারীতের চেয়েও বড় ভুল করেছে সে ভুলের পরিমাপ হয় না, তা ক্ষমার অযোগ্য।

শুভেন্দু নামের মানুষটা যেন দুঃস্বপ্নের এক বোঝা, মিথ্যে একটা নাম, সে নামের কোন অস্তিত্ব নেই।

কিছুদিন আগে কুশলের মুখে শুভেন্দু শুনেছিল যে অমিতা অসুস্থ। দারজিলিং থেকে ফেরবার পর তার নিজের জীবনের সমস্যা-কণ্টকিত দিনগুলি তাকে এমন বিভ্রান্ত করে রেখেছিল যে, আর কোন কথা তার মনে স্থায়ী হতে পারেনি। অনিন্দ্যর সঙ্গে অমিতার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে এ-কথা কোন সূত্র থেকে সে জেনেছিল, শুভেন্দু কল্পনা করে নেয় যে, অমিতা হয়তো এতে খুবই দুঃখ পেয়েছে, তাদের দুজনের দুঃখ দুই রকম হলেও এও বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ। ডাক্তার হিসেবে শুভেন্দু অমিতাকে দেখতে আসে না, আত্মীয় হিসেবেই আসে।

শুভেন্দুকে দেখে অমিতা বলে ওঠে—একি, শুভেন্দুদা তুমি? দারজিলিং থেকে কবে ফিরলে? সুরঙ্গমা কেমন আছে? তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়, বেশ ভালো আছ না শুভেন্দুদা?

এক সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলে অমিতা হাঁফাতে থাকে।

অভিজ্ঞের চোখে চেয়ে শুভেন্দু বললো—কিছুদিন আগে কুশলের মুখে শুনেছিলাম তোমার শরীর ভালো নেই কিন্তু আমি আসতে পারিনি, এখন কেমন আছ অমিতা?

একখানা বেতের চেয়ার টেনে এনে শুভেন্দু অমিতার পাশে বসলো। বললো—বড় রোগা হয়ে গেছ!

অমিতা হাসলো, বললো—আমি এখন ভালই আছি। আমার কথার তো একটিও উত্তর দিলে না, সুরঙ্গমা কেমন আছে?

শুভেন্দু মাথা নীচু করে বললো—জানি না।

—জান না মানে কি? কি বলছ শুভেন্দুদা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!

শুভেন্দু একটু চুপ করে থেকে তারপর দু আঙুলে মাথাটা টিপে ধরে বললো—

—আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। অমিতা স্তম্ভিত হয়, এও কি সম্ভব? সচ্চরিত্র, হৃদয়বান, কর্তব্যনিষ্ঠ শুভেন্দুকে সে ছোট বেলা থেকে ভাল করেই চেনে আর সুরঙ্গমার মত কোমল মধুর স্নিগ্ধ স্বভাবের মেয়ে। অমিতা কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছিল।

একটু পরে শুভেন্দু নিজেই বললো—কেন তা জিজ্ঞাসা কোরো না, সে কথা বলতে পারব না।

শুভেন্দুর কণ্ঠস্বর কেমন অস্বাভাবিক করুণ! অমিতা চুপ করে থাকে। যে বেদনার কাহিনী শুভেন্দু প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নয় তাকে সে খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। জানে শুভেন্দুর মত সংযত প্রকৃতির মানুষ কম আঘাত পেয়ে এ-বিচ্ছেদ ঘটায়নি, কিন্তু আশ্চয হয়ে ভাবে সুরঙ্গমার মত মেয়ে, নম্র, শান্ত, আত্মমগ্ন, যে-মেয়ে, তার দিক থেকে কোন আঘাত এসেছে এ-কল্পনাও তো কষ্টসাধ্য। অমিতার মনে কেমন সন্দেহ জাগে কোন ভুল বোঝার জটিলতা এখানে আসেনি তো? ভাল করে তার জানতে হবে। দুজনেরই বিচ্ছেদ বেদনার গভীরতা সে অনুভব করে, সংকল্প করে ভাঙ্গাকে জোড়া দেওয়া যদি সম্ভব হয় সে প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখবে। মুখ তুলে বলে—শুভেন্দুদা, সঞ্জয়দার বাড়ীতে গিয়ে আমি সুরঙ্গমার সঙ্গে দেখা করব।

শুভেন্দু বিষণ্ণ একটু হেসে বলে—সে এখানে নেই, বিলেতে চলে গেছে শুনেছি।

এর পর শুভেন্দু অনেকদিন আসেনি। অমিতা ওদের কথা ভেবে সব সময় দুঃখ বোধ করে, এমন সুন্দর দুটি জীবন কেমন করে কোন্ ঝড়ের ঝাপটায় ঝরাফুলের মত ব্যর্থ হয়ে গেল! শুভেন্দু আর একবার এসেছিল। অনুতাপের অন্তর্দাহ যেদিন দাবানলের মত তাকে ঘিরে ধরেছিল সেদিন অমিতার কাছেই ছুটে এসেছিল শুভেন্দু।

ওকে দেখে সেদিন ভয়ানক ভাবে চমকে উঠেছিল অমিতা, যেন আগুনের কুণ্ড থেকে আধপোড়া হয়ে সত্ত সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে এম্‌নি কালিমাময় চেহারা। ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে ওকে ঘরে এনে বসাল সে, কাতর হয়ে বললো—শুভেন্দুদা, দুঃখ তো মানুষের কাছে অনেক পথেই আসে, বিচ্ছেদের দুঃখও কত মানুষের জীবনে আছে, তুমি নিজেকে মেরে ফেলছো শুভেন্দুদা!

অমিতার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। শুভেন্দু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি, তারপর আস্তে আস্তে উত্তর দেয়—অমিতা, এ বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ নয়, তার চেয়েও এ অনেক বেশী অসহ্য, আমি যে কি ভয়ানক ভুল করেছি তাতো তুমি জানো না। সুরঙ্গমার সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার জীবনের প্রতি মুহূর্তের অসহনীয় যন্ত্রণার ইতিহাস সেদিন শুভেন্দু অকপটে উন্মুক্ত করেছিল অমিতার কাছে, তারপর বলেছিল—আমার কাছে বেঁচে থাকবার আজ আর কোন অর্থ নেই। নিজের ওপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, জীবনের কোন মোহ নেই এরপর কি করব জানি না!

অমিতা ভয় পায় ওর কথা শুনে, বলে—শুভেন্দু দা, তুমি যে ভুল করেছো আর কেউ হলে এই অবস্থায় অন্য কিছু করতে পারতো বলে আমার বিশ্বাস হয় না, কেন তুমি নিজের ওপর সব দোষ টেনে নিচ্ছ?

—বিদ্বেষের জ্বালায় অন্ধ হয়ে বিচার বুদ্ধি হারিয়েছিলাম অমিতা, না হলে যে আমাকে অকুণ্ঠ বিশ্বাসে তার যথাসর্বস্ব সমর্পণ করেছিল তার ওপর এমন নিষ্ঠুর অবিচার কেমন করে করলাম!

অমিতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো তারপর বললো—শুভেন্দু দা, তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি সুরঙ্গমাকে এ সব কথাই জানাই। তার সম্বন্ধে ভুল করে তুমি যে কি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছ সে কথা তার জানা দরকার।

শুভেন্দু ব্যাকুল হয়ে বলে—না অমিতা, অনেক দুঃখ সে পেয়েছে

আমার কাছ থেকে, এখন তার বর্তমান নিয়ে তাকে শান্তিতে থাকতে দাও, আমি তার জীবনে অতীত হয়ে গেছি, আমাকে আর সে ভালবাসতে পারবে না।

শুভেন্দুর কথাগুলো কান্নার মত শোনায়।

॥ পঁচিশ ॥

একদিন সকাল বেলা জাহ্নবী দেবীর আকস্মিক আগমন ডঃ রায়কে সচকিত করে তোলে, সবিস্ময় আনন্দে তাঁরা ওঁকে অভ্যর্থনা করেন। ধরিত্রী দেবী এগিয়ে এসে ওঁর পায়ের ধুলো নেন তারপর একখানি কার্পেটের আসন বিছিয়ে দিয়ে বলেন—বসুন দিদি! আমার অনেক ভাগ্য যে আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন!

জাহ্নবী দেবী হাসিমুখে বলেন—বিনা স্বার্থে আসিনি বোন, নিজের কাজেই এসেছি। ডঃ রায়ের দিকে ফিরে বলেন—রায় মশাই, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

ডঃ রায় সসঙ্কোচে বলেন—ও রকম করে বলে আমায় অপরাধী করবেন না, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো আমি আপনার ওখানে যেতাম। তবে আপনি যে অনুগ্রহ করে এসেছেন এটা অবশ্য আমাদের পক্ষে আনন্দের কারণই হয়েছে।

জাহ্নবী দেবী বললেন—কিন্তু আমার চাওয়ার কথাটা শুনলে বিমুখ করবেন না তো? আমার ছেলের জন্যে আপনার ওই লক্ষ্মী মেয়েটিকে আমি চাই।

সবিনয়ে ডঃ রায় উত্তর দেন—আপনি যদি আপনার ছেলের যোগ্য বলে ওকে মনে করে থাকেন তবে সে ওর অশেষ সৌভাগ্য মনে করি কিন্তু এ-কথাটা বলবার জন্যে আপনি নিজে এসেছেন এতে বড় সঙ্কোচ বোধ করছি।

জাহ্নবী দেবী হাসতে হাসতেই বলেন—আমার ছেলের জন্যে

অনেক খোঁজাখুজির পর আমি এই রত্নটি আবিষ্কার করেছি, পাছে হাত ছাড়া হয়ে যায় সেই ভয়েই ছুটে এসেছি। আমার অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা যে পূরণ করবে, ঘরে বসে অনায়াসে তাকে পাবার আশা করতে নেই।

ধরিত্রী দেবী সজল চোখে বলেন—আমার মেয়েকে আপনি স্নেহের মূল্যেই কিনে নিয়েছেন, ও যেন আপনার এই স্নেহের মর্যাদা দিতে পারে।

জাহ্নবী দেবীকে আবার প্রণাম করতেই তিনি ধরিত্রী দেবীর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—বারে বারে কেন? তা প্রণাম করতে পার, তুমি আমার ছোটবোনের মত।

এক নিরালা অবসরে অমিতা কুশলকে বলেছিল—এই আপনি বলার সম্মানের ব্যবধানকে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন?

কুশল মৃদুস্বরে বলে—মনে মনে কতদিন তোমাকে তুমি বলে ডেকেছি কিন্তু বাইরে বলতে সাহস পাইনি, আজ সাহস দিলে তাই বলতে পারলাম। আমার জীবনে তুমি যে অপরিমিতা, এতদিন কোন সম্বোধন করিনি আজ থেকে তুমি আমার অমিতা।

অমিতা সলজ্জ চোখ দুটি নামিয়ে নেয়।

তাদের মিলন দিনের শুভলগ্নে কুশল শুভেন্দুর খোঁজ করেছিল কিন্তু অমিতা মনে মনে তাকে চায়নি। সে জানে তার বেদনা তার মনকে এমন অভিভূত ও অসাড় করে রেখেছে যে কোন উৎসব আর তার মধ্যে আনন্দের অনুভূতি আনবে না। কুশল শুভেন্দুকে পায়নি, তার সহকর্মী ডাক্তারদের কাছে শুনেছিল সে লক্ষ্ণৌতে তার নিজের বাড়ীতে চলে গেছে। সেখানে চিঠি লিখেছিল। শুভেন্দু তার উত্তরে

জানিয়েছে যে, সে ওখানকার কোন গ্রামে সামান্যরকম একটা হাসপাতাল স্থাপনার কাজে খুব বেশী ব্যস্ত আছে। প্রার্থনা করেছে তাদের যুক্তজীবন আনন্দময় হোক, কোন আবিলতা যেন সেখানে না আসে।

॥ ছাব্বিশ ॥

সুরঙ্গমা স্নিগ্ধার কাছে প্রায় সব চিঠিতেই অরিন্দমের কথা লেখে। এত বেশী লেখে যে সঞ্জয় আর স্নিগ্ধা বিস্মিত হয়। অরিন্দমকে ভাল লাগাটা চিঠিতে যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। সঞ্জয় ভয় পায়—সংসার অনভিজ্ঞ মেয়েটা আবার জীবনের কোন জটিলতায় জড়িয়ে না পড়ে, তবু এই নিয়ে সুরঙ্গমাকে কোন আদেশ উপদেশ দিতে তার ইচ্ছা হয় না। কৃষ্ণরাওয়ের কাছে অরিন্দমের পরিচয় জানতে চায়, সে ওকে জানায় ছেলেটির সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ, কলকাতায় ওর বাড়ী, ছেলেটি সৎ এবং বুদ্ধিমান। এসব কথা শুনে সঞ্জয় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়।

সঞ্জয় সুরঙ্গমাকে শুধু লেখে সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, জীবনের সব ক্ষেত্রে সে যেন নিজের বিচার বুদ্ধিকে ব্যবহার করে। এর বেশী কিছু লিখতে তার মন চায় না। সুরঙ্গমার মনে আছে, লণ্ডনে আসবার সময়ও দাদা তাকে এই কথাই বলেছিল। শত সহস্র উপদেশ দেয়নি, শুধু বলেছিল জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বহুজনের সঙ্গে এবার তাকে চলতে হবে নিজের বিচার বুদ্ধিকে সে যেন কখনও না হারায়। অমিতার কথা সুরঙ্গমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে অমিতা এক সময় বলেছিল—জীবনের পথে সচেতন হয়ে পথ চলতে হয় সুরঙ্গমা, নইলে পথের পাথরে ঠোক্কর লাগে। সুরঙ্গমা ভাবে পথের পাথর তার জীবনকে তো রক্তাক্ত করেছে তবে কি শুভেন্দুকে ভালবেসে সে ভুল করেছিল?

দারজিলিংয়ে ঘর বাঁধার প্রথম দিনগুলো মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়ে। লঘুপক্ষ বিহঙ্গের শূন্যে পক্ষ বিস্তার করে যে দিনগুলো অনায়াস আনন্দে অগাধ নীলের পারাবারে ভেসে চলেছিল সে কি ছিল অবাস্তব কল্পনা, তার মধ্যে কি সত্যতা ছিল না। কিন্তু একদিন নয় দুদিন নয়, দিনের পর দিন সে শুভেন্দুর সঙ্গে মিশেছে, নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে তাকে যাচাই করেছে, কখনও তো মনে হয়নি যে, তার ভালবাসায় খাদ আছে। মানুষ হিসেবে তবে কি শুভেন্দু খাঁটি ছিল না, নকল হীরের মত কেবলই চোখকে ধাঁধিয়েছিল? না, না, শুভেন্দু, আমার শুভেন্দু, যে আমাকে ভালবেসেছিল, আমার ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিল, সে ছিল খাঁটি হীরে, সেদিন তাকে আমি চিনতে ভুল করিনি কিন্তু তবু কেন এমন হল? পথের পাথরে ঘা খেয়ে কেন আমার সমস্ত জীবনটা এমন রক্তাক্ত হয়ে গেল?

হঠাৎ চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে সুরঙ্গমা। না, না, সে আমার কেউ নয়, আমার বুকভরা ভালবাসার মর্যাদাকে যে দুই পায়ে ঠেলে গেছে—সে নিষ্ঠুর, সে অমানুষ, তাকে আমি চাই না।

বড়দিনের ছুটিতে সুরঙ্গমা জিনের ওখানে এসেছিল। জিন ওকে ছাড়তে চায় না। অরিন্দম রোজই আসে সুরঙ্গমাও তাকে প্রত্যাশা করে, ওকে ভালো লাগে।

জিন্ বলে—অরিন, সুমির তো কদিন ছুটি আছে ওকে তুমি তো কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে পার। সুমি, প্যারিসে বেড়াতে যাবে? আল্পস্ (Les Alpes) পাহাড় দেখতেও যেতে পার, জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা সাইকেলে পাহাড় দেখতে চলেছে দেখতে পাবে। ওপরে উঠলে গ্লেসিয়ার (Glacier) দেখে ভারি

ভালো লাগবে। খুব চমৎকার। বুঝলে অরিন, আমাদের সুমিটা ভারি ঘরকুনো, ওর এই স্বভাবটা ছাড়াও তো দেখি।

অরিন্দম হাসে। সুরঙ্গমা লজ্জিত মুখ নীচু করে। একলা অরিন্দমের সঙ্গে পথ-চলা কল্পনা করতে ভালো লাগে কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। মন চায় কিন্তু সঙ্কোচের বাধা মনকে জড়িয়ে ধরে।

এর কিছুদিন পরে এক দিন অরিন্দমকে লণ্ডনে তাদের বাড়ীর সামনে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হল সুরঙ্গমা, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। হাসিমুখে বললো—আপনি? আমাকে তো কই বলেননি যে আপনি এখানে আসবেন, হঠাৎ কোন কাজ পড়েছে বুঝি?

অরিন্দম বলে—আমিই কি জানতাম যে এখানে আসব, কেমন করে কিসের টানে যে এসে পড়লাম বলতে পারছিনে।

সুরঙ্গমা মুখ নীচু করে তারপর মুখ তুলে বলে—চলুন ওপরে আমার ঘরে বসবেন চলুন।

অরিন্দম বলে—তার চেয়ে চলুন না বাইরে বেরিয়ে পড়ি, অবশ্য তাতে যদি আপনার কোন অসুবিধে না থাকে।

সুরঙ্গমা আপত্তি করে না, বলে—তবে আমি তৈরি হয়ে আসি। আপনি এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকবেন?

অরিন্দম হেসে বলে—আপনি নেমে এলেই তুজন হব।

তুজনে বাইরে যায়। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করে—কোন্‌দিকে যাবেন?

—আপনার যে দিকে খুশী।

তুজনে হল্‌ওয়ে রোড্ ধরে চলতে চলতে টিউব স্টেশনে পেঁ ৗছে যায়, পিকাডিলির টিকিট কিনে লিফ্‌টে করে নীচে নেমে টিউব ট্রেনে তুজনে পাশাপাশি বসে। সান্নিধ্যের উত্তাপ তুজনের মনেই সংক্রমিত হয়, কেউই কথা বলতে পারে না।

ট্রেন থেকে নেমে আলো ঝলমল জনাকীর্ণ পিকাডিলিতে উঠে

ওরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। এতক্ষণে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে অরিন্দম বলে—চলুন ওই রেস্টুরেন্টে ঢোকা যাক।

ডিসেম্বরের শীত-কণ্টকিত সন্ধ্যা। এক টেবিলে ওরা দুজনই বসেছে, অরিন্দম জিজ্ঞাসা করে—কি আনতে বলব ?

সুরঙ্গমা কথা বলে না, আবেশ-মাখা চোখ দুটি তুলে একবার অরিন্দমের মুখের দিকে তাকায়, অরিন্দম কোন জবাব না পেয়ে তার ইচ্ছামত খাবারের অর্ডার দেয়।

দুজনেরই অজান্তে কখন যেন মন আরো নিবিড় হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে সুরঙ্গমার হাতখানি ধরে অরিন্দম, সুরঙ্গমা ছাড়ায় না, ওর ঠাণ্ডা নরম হাতখানা অরিন্দমের হাতের মধ্যে মৃদু মৃদু কাঁপতে থাকে। অরিন্দম বলে—ইস্ আপনার হাতখানা কি ঠাণ্ডা! দস্তানা পরেননি কেন ?

সুরঙ্গমা কোন জবাব দেয় না। অরিন্দম নিবিড় আশ্লেষে ওর হাতখানা আরও চেপে ধরে। এবার ওর হাতের উত্তাপে সুরঙ্গমার হাতখানি তপ্ত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনও।

মাস দুই পরে আবার একদিন। লণ্ডনে রামচন্দ্র নারায়ণ দাণ্ডেকারের বাড়ীর নীচে কলিংবেল বেজে উঠলে দাণ্ডেকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। ভারতীয় প্রথায় তাঁকে নমস্কার করে অরিন্দম জিজ্ঞাসা করলো—এখানে মিস্ মিটার নামে যে বাঙ্গালী মহিলাটি থাকেন অনুগ্রহ করে তাঁকে একটু জানাবেন কি ?

নিজের নামের কার্ডখানি অরিন্দম তাঁর হাতে তুলে দিল।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আপনি দয়া করে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।

বলতে বলতে উনি উপরে উঠে গেলেন, দু তিন মিনিটের মধ্যেই সুরঙ্গমা চঞ্চল পায়ে নীচে নেমে এলো, তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত।

অরিন্দম বলে—কিছুদিন আগেই এসেছিলাম, আবার এলাম দেখে বিরক্ত হচ্ছেন না তো ?

সুরঙ্গমা হাসে কোনও জবাব দেয় না।

—কি করি বলুন, একলা ঘরে আর থাকতে পারছিনে। বৈষ্ণবসাহিত্যে আছে না, কানুর বাঁশী শুনে রাই উন্মাদিনী হয়ে ঘর ছাড়তেন—এখানে ঠিক উল্টো হল, আমার বুকের মধ্যে কি সুর যে বাজালেন তা আপনিই জানেন !

অকপট স্বীকারোক্তি! অকুণ্ঠিত প্রকাশ। সুরঙ্গমা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। এমন করে কি লোকে মনের কথা বলে, একটু রেখেঢেকে বলতে হয়। যদিও বাংলা ভাষা কারু বোঝার সম্ভাবনা নেই তবু সুরঙ্গমা শঙ্কিত চোখে চারিদিকে তাকায়, একটা ঢোঁক গিলে বলে চলুন, ওপরে বসবেন।

—না ঘরে নয়, আপনার যদি অনুমোদন থাকে—।

সুরঙ্গমা বলে—না, অসুবিধে কিছু নেই।

দুজন রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে অরিন্দম বলে—আপনার হাঁটতে বোধহয় কষ্ট হচ্ছে, চলুন পার্কের ওই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসি।

ফেব্রুয়ারি মাসের দুরন্ত শীত, দুদিন আগে ভয়ানক তুষারপাত হয়েছিল, এখনও বরফ সম্পূর্ণ গলেনি। কয়েকটা উলের জামার ওপরে ভারি ওভারকোট গায়ে দিয়েও হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডায় সুরঙ্গমা আড়ষ্ট হচ্ছিল। অরিন্দম সেটা লক্ষ্য করে বললো—ভারি অন্যায় করলাম, ঘরে আগুনের কাছে বসে হয়তো পড়াশোনা করছিলেন স্বার্থপরের মত রাস্তায় টেনে বার করলাম। ঠাণ্ডা বাতাস সূঁচের মত মুখে চোখে বিঁধছে, না ?

সুরঙ্গমা কিছু না বলে একটু হাসে কিন্তু তার স্বাভাবিক লাল ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, দেখে অরিন্দম বলে—কেন আসতে আপত্তি করলেন না, আমার জুলুম কেন মেনে নিলেন ? আমাকে যত বেশী

প্রশ্রয় দেবেন ততই আপনাকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, আমি ভারি দুরন্ত, আমায় তো আপনি চেনেন না!

সুরঙ্গমা হাসতে হাসতে বলে—আপনার দুরন্তপনার সীমা কতদূর তা জানবার জন্যেও তো প্রশ্রয় দেওয়া দরকার।

—তার কোন সীমা নেই, আমাকে শাসন করবেন, নইলে—

সুরঙ্গমা হাসিমুখে বলে—নইলে কি ?

—নইলে বাঁধ ভেঙ্গে আমার উদ্দাম প্রকৃতি হয়তো এক সময় আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমার নিজেকে আমি নিজেই ভয় পাচ্ছি।

সুরঙ্গমাও এবার ভয় পায়। অরিন্দম হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলে—চলুন ফিরে যাই।

পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতেই পথচারীদের অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ততা দেখে ওরা আশ্চর্য হয়। কারণ অনুসন্ধান করতেই শুনতে পেল কুয়াশা আসছে তাই পথঘাট নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে যাবার আগেই পথিকরা আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে, এরপর আর দিকের নিশানা থাকবে না।

সুরঙ্গমা আগে কখন তো দেখেনি কিন্তু এ-দেশের কুয়াশা সম্বন্ধে অরিন্দমের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সে বললো—কুয়াশা আসছে এ-এক মুশকিলের অবস্থা হল, যানবাহন রাস্তাঘাট সব অন্ধকারে ঢেকে যাবে, চলুন আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটি।

খানিকটে পথ অতিক্রম করতে না করতেই গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, দূরের জিনিস কিছুই চোখে পড়ে না শুধু ধীরগতি গাড়ীগুলোর আলো অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

অরিন্দম বললো—ভয় পাবেন না, আমার কাছে সরে আসুন, আমরা বাড়ী থেকে বেশী দূরে নেই, আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেব।

অরিন্দম হাত বাড়িয়ে সুরঙ্গমার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে আনে, দুজন আস্তে আস্তে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে।

॥ সাতাশ ॥

জিনের অনুযোগ-ভরা চিঠি এসে পৌঁছাল, অনেক দিন হয়ে গেছে সুরঙ্গমা তার ওখানে যায়নি। জিন্ লিখেছিল সে কৃষ্ণরাওয়ের কাছে শুনেছে অরিন ছুটি পেলেই আজকাল লণ্ডনে চলে যায়, সে বুঝতে পারছে তাই ওর ওপর আর সুরঙ্গমার টান নেই। অরিন ওর বন্ধু ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে এ-জন্যে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

সুরঙ্গমা চিঠি পড়ে হাসলো। পড়াশোনা আর কাজকর্মের চাপে বহুদিন সে ওদের ওখানে যায়নি, এর মধ্যে অরিন্দম দু তিন বাব এসেছে। এবার সুরঙ্গমাকে পেয়ে জিন ওকে জড়িয়ে ধরে বললো —সুমি, একটা সত্যি কথা বলবে ?

সুরঙ্গমা ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

জিন্ বলে—তুমি অরিনকে ভালবাসো ?

—ঠিক বুঝতে পারছিনে, হয়তো বাসি।

জিন আবার প্রশ্ন করে—আর, ও ?

—আমার তো মনে হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জিন্ খিল খিল করে হেসে ওঠে। বিকেল বেলা অরিন্দম আসে। বলে—সুরঙ্গমা, বেড়াতে যাবে ?

সুরঙ্গমা বলে—কোথায় যাবো ?

—এমন কোথাও চলো, যেখানে তুমি আর আমি নিজেদের সত্তা অনুভব করতে পারি। চলো বর্ডারে সাল্যাভ (Saleve) পাহাড়ে গিয়ে আজকের ছুটির সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি। ওখানে বেশী ভিড় পাবে না।

—দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল সুরঙ্গমা। জিন রান্নায় ব্যস্ত, প্যানকেকের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুরঙ্গমা বললো—ওঃ তুমি যেন রান্নায় দ্রৌপদী। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বোকার মত ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো জিন্। সুরঙ্গমা হেসে বললো—আমাদের দেশের পুরাণে আছে দ্রৌপদী নাম্নী রাজ-পরিবারের একটি মহিলা রান্নায় খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করে-ছিলেন তাই আমরা সুপাচিকার তুলনা দিতে গেলেই তার নাম উল্লেখ করি।

জিনের গোলাপী গাল আগুনের তাতে আরও রাঙা হয়ে উঠেছিল। সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, হাসি মুখে বললো—কি নাম বললে? একটা বিকৃত উচ্চারণ করলো নামটা বলার চেষ্টায়।

সুরঙ্গমা হেসে বলে—ও তোমাকে অন্যদিন শিখিয়ে দেব। অরিন এসেছে, আমরা বেরুচ্ছি, তোমায় বলে যাচ্ছি আমাদের ফিরতে দেরি হলে কোন ভাবনা কোরো না।

—ওমা তাই নাকি?—খুশীতে জিন্ ডগমগ। বললো—কিছুদিন হল দেখছি তোমার ভয়টা বেশ কেটে গেছে। আজকের সন্ধ্যাটা তোমাদের আনন্দময় হোক অরিনকে এই সিদ্ধান্তের জন্যে আমার অভিনন্দন জানাবে।

খুব তাড়াতাড়ি প্রসাধন সেরে নিয়ে ওভার কোটটা হাতে সুরঙ্গমা বেরিয়ে আসতেই অরিন্দম সেটা হাতে তুলে নেয় তারপর সযত্নে ওকে সেটা পরিয়ে দেয়। বাইরে এসে দুজন ট্রামে উঠে বসে।

তেলেফেরিক (Teleferique)-এ পাহাড়ের ওপর ওঠাটা সুরঙ্গমার কাছে নতুন, সে বেশ উপভোগ করলো। ওপরে উঠে দুজন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। জেনেভা শহরটা ছবির মতো দেখা যাচ্ছে, ঘন নীল জেনেভা লেকের জলে দুধে-সাদা রাজহাঁসগুলো সঙ্গিনীকে পাশে নিয়ে অনায়াসলীলায় ভেসে চলেছে, সেই দিকে চেয়ে সুরঙ্গমার মনে হয় জীবনটা বড় মধুর। আস্তে আস্তে অরিন্দমের কাঁধে মাথা রাখে সুরঙ্গমা, অরিন্দম হাত বাড়িয়ে ওকে

আরও কাছে টেনে আনে, ওর মাথাটা বুকের ওপর টেনে নেয়। মুখ নীচু করে গভীর আবেগে ওর অধর স্পর্শ করে, অনেকক্ষণ, সে আবেগ যেন ফুরোয় না।

দূরে পাহাড়ের গায়ে গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে। তাদের গলার ঘণ্টার টুংটাং শব্দ ভারি মিষ্টি।

অনেক দিন পরে যেন বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় সুরঙ্গমা।

॥ আঠাশ ॥

পিটারের বাড়ী হার্টফোর্ডশায়ারের ছোট একটি গ্রামে, তার নাম সেকস্ব্। লণ্ডন থেকে দূরত্ব প্রায় ত্রিশ মাইল, বাসে যেতে ঘণ্টা দুই লাগে। গরমের সুদীর্ঘ ছুটিতে পিটার তার গ্রামের বাড়ীতে এসেছিল তার বাবা মার কাছে কাটাতে, তার ছোট স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকে। মাঝে মাঝে ডরোথি এসে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়। ডরোথির স্মৃতিতে বড় ব্যথা, আঘাত দিয়ে সে দূরে সরে গেছে আর কি সে তার কাছে ফিরে আসবে? এ-চিন্তা তার মনকে দুর্বল করে। সুরঙ্গমাকে বলে এসেছে—ও দুর্বলতাকে, দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করবে। ছবির মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দিয়ে পিটার দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে তার মনের চিন্তাধারা ভিন্ন পথ নেয়, তার ছবি তাকে টেনে নিয়ে যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে যেখানে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অনুভূতি নেই, সেখানে সৃষ্টির আনন্দে সে মগ্ন হয়।

এমনি করে যখন সে নিজের মনকে প্রায় শান্ত করে এনেছে তখন একদিন ডরোথির টেলিফোন তাকে বিস্মিত করে, বিচলিত করে। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে কয়েক দিনের জন্যে ডরোথি লণ্ডনে এসেছে, সে পিটারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। নিদাঘের রৌদ্রোজ্জ্বল মনোরম সকাল নতুন করে আশার আলো নিয়ে দেখা দেয় পিটারের

চোখে, তার মনকে অশান্ত করে, সে গ্রীনলাইন বাসে চড়ে বসে লণ্ডনের পথে।

বাসে উঠে পিটার জানলার বাইরে দৃষ্টিকে মেলে দেয়, অতীত স্মৃতির রোমন্থন করে।

ফিনিক্স ক্লাবেই ডরোথির সঙ্গে তার পরিচয়, প্রথম দেখাতেই ডরোথির রূপ তাকে আকৃষ্ট করেছিল। কয়েক দিন পরে সে তাকে অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে, ডরোথি আপত্তি করেনি, সাগ্রহেই রাজী হয়েছিল। পিটারের মনে সেদিন কী যে অপরিসীম আনন্দ, তার সামান্য পুঁজি থেকে রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে একটা ব্যালের দামী টিকিট কিনেছিল সে, পিটারের মনে আছে ব্যালেটা ছিল চাইকভ্স্কির বিখ্যাত 'সোয়ান লেক' এবং তাতে নামছিলেন মার্গো ফন্টেন স্বয়ং।

কথা ছিল চেয়ারিংক্রস্ স্টেশনে ওরা তুজনে সন্ধ্যায় মিলিত হবে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে ব্রিজের ওপর দিয়ে টেম্স্ পার হয়ে ফেস্টিভ্যাল হলে পৌঁছবে।

সেদিন তার মনে কি উত্তেজনা! নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সে স্টেশনে পৌঁছে যায় তারপর তার অধীর পাদচারণা। অগুন্তি মানুষের স্রোত, ট্রেন আসছে যাচ্ছে। পিটার ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়, একটা সান্ধ্যকাগজ কিনে তাতে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করে। ফুটবল পুলে কে তিনলক্ষ পাউণ্ড পেয়েছে, কোন্ ডাচেসের বিরুদ্ধে তার স্বামী মামলা করেছেন, আজকের খেলায় আর্সেনাল জিতবে না বার্মিংহাম সিটি এমন অনেক খবর বেরিয়েছে যা সাধারণ জনের মনকে আলোড়িত করে। পিটারের কোনদিনই এসব হাল্কা খবরে রুচি নেই, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর গাম্ভীর্যই তার পছন্দ, কাগজখানা মুড়ে হাতে নিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি তার উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়, ডরোথির হাসিমুখ দেখা যায়। ঘন নীল রংয়ের স্কার্টের ওপর হলদে রংয়ের

একটা ব্লাউজ পরেছে সে, সুন্দর মুখ ঘিরে বেঁধেছে একটা রঙ্গীন স্কার্ফ। সেই অপূর্ব রং বাহারের পোশাকে ওকে পিটারের ভাবি ভালো লাগলো, হাসিমুখে বললো—ডরোথি, তোমাকে 'ভ্যান্‌গো'ব একখানা ছবির মতো দেখাচ্ছে।

—ভ্যানগো কে ?—ভ্রূকুঞ্চিত করে ডরোথি প্রশ্ন করে—নাম শুনে তো ইংরেজ মনে হয় না!

কিঞ্চিৎ আহত হয়ে পিটার বলে—ভ্যানগো ডাচ ছিলেন। অবশ্য জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই ফ্রান্সে কাটিয়েছেন। দুঃখেব বিষয় অমন প্রতিভাধর শিল্পী শেষে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

ডরোথি বলে—পাগল লোকের কথা থাক্, চলো কিছু খাওয়া যাক্।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। পিটার অপ্রতিভ হয়ে বলে—আমাদেব সময়ও বেশী নেই।

ভিলিয়ার্স স্ট্রীটের একটা ছোট্ট রেস্টুরেণ্ট-এ দুজন ঢোকে, পিটার জিজ্ঞাসা করে—কি পান করবে ডরোথি ?

ডরোথি সুইট মার্টিনির নাম করে।

ওরা ফেস্টিভ্যাল হলে গিয়ে বসে। মার্গো ফন্টেনের অপূর্ব নৃত্য-কলা পিটারকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, বহুক্ষণ সে একটিও কথা বলে না, কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় বুঝতে পারে না। অনুষ্ঠান শেষ হলে টেম্‌স্ নদীর ধারে ফেস্টিভ্যাল হলের রেস্টুরেণ্টে বসে ওরা কফির ফরমাস দেয়। কফি খেতে খেতে ডরোথি মন্তব্য করে—আমার কিন্তু ব্যালেট্যালের চেয়ে সিনেমা বেশী ভাল লাগে অবশ্য ডিটেক্‌টিভ গল্প হলে।

পিটারের মনের সব ভাব এলোমেলো হয়ে যায়, সেদিন গল্প আর তেমন জমে না। এই প্রথম দুঃখ পাওয়া ডরোথির কাছ থেকে পিটার ভুলতে পারেনি।

বাসের গতিবেগের সঙ্গে পিটারের চিন্তা ধারাও যেন ছুটে

চলেছে। আর একদিনের কথা মনে পড়ে। পিকাডিলির সোয়ান এ্যাণ্ড এড্‌গার-এর সামনে দেখা করে দুজন সন্ধ্যেবেলা। পিটারের মনের কানায় কানায় উপচে পড়ছিল এক অনির্বচনীয় ভালবাসার স্রোত, অনেক কথা তখন ভিড় করে এসেছিল মনে কিন্তু মুখে সে কিছুই বলতে পারেনি, আবেগরুদ্ধ গলায় শুধুই বলেছিল, শুভসন্ধ্যা ডরোথি।—অনুক্ত সে আবেগ ডরোথির মনকে স্পর্শ করেছিল কিনা কে জানে, শুভসন্ধ্যা জানাবার পরেই ডরোথি প্রথম কথা বলেছিল —আমরা আজ কোথায় খাচ্ছি পিটার, দেখো যেন লায়ন্সে ঢুকিও না বাপু। পিটারের কানে কেমন খাপছাড়া লেগেছিল কথাটা। চড়াসুরে বাঁধা মনের তার যেন হঠাৎ ছিঁড়ে খান খান হয়ে গিয়েছিল।

দুজনে হাতে হাত দিয়ে চলতে থাকে, গ্রীন পার্কের সামনে এসে পিটার থামে। পাশে কাফে মোৎসার্ট, ছোট্ট কিন্তু খুব সুন্দর একটি রেস্টুরেণ্ট। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে দুজন, অ্যাটেণ্ড্যান্ট এসে নাম জিজ্ঞাসা করে। পিটার আগে থেকেই ঘরের কোণে দুজনের একটা টেবিল রিজার্ভ করে রেখেছিল অ্যাটেণ্ড্যান্ট সেটা দেখিয়ে দেয়। সুন্দর সাজানো ছোট একটি ঘর, প্রত্যেক টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া, বিদ্যুতের প্রখরতা নেই, মৃদু আলোর রমণীয় পরিবেশ। পিটার মেনুটা তুলে দেয় ডরোথির হাতে, বলে—আজকে কিন্তু আমরা খাবারের সঙ্গে শ্যাম্পেন পান করব।

ডরোথি ভয়ানক খুশী হয়ে বলে—ভালই তো, আশা করি নেশা হবে না।

পিটার বলে—আজকে আমরা সব বাস্তবতা ভুলে যেতে চাই, স্বপ্নের জগতে যাব, হোক না নেশা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বেহালা হাতে এক বাদক, পিটার ইশারা করে তাকে ডাকে, হাতে একটা দশ-শিলিংয়ের নোট দিয়ে মোৎসার্টের একটা সুর বাজাতে বলে। সুরের ঝঙ্কারে ঘরের বাতাস মধুর হয়ে উঠে।

মোমবাতির কম্পমান শিখার আলোয় ডরোথিকে পিটারের চোখে অপরূপ মনে হয়; সে আবেগ ভরে বলে—আজকে আমার হৃদয় পূর্ণ, শুধু তুমি আর আমি, জীবনে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই আমার।

ডরোথি বলে—কিন্তু আমার আরও অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে। ভালো পোশাক অলংকার, ভালো বাড়ী বড় গাড়ী এ সবই আমার চাই—অনেক টাকা না হলে জীবনকে উপভোগ করা যায় না পিটার।

পিটার বলে—জীবনকে উপভোগ করবার জন্যে টাকাটাই কি একমাত্র জিনিস ডরোথি, দুজনের ভালবাসাই কি বড় সম্পদ নয়?

ডরোথি গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—একমাত্র না হলেও টাকাটাই যে সব চেয়ে বড় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, দারিদ্র্যের উত্তাপে প্রেমের ফুল শুকিয়ে যায় পিটার।

পিটার চুপ করে থাকে, তারপর শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে—ডরোথি, তুমিই আমার শ্যাম্পেন।

ডরোথি একটু হেসে উত্তর দেয়—আমি শুধু নই অনেক মেয়েই তোমার শ্যাম্পেন, মিঠে আলাপে তুমি সুনিপুণ।

বাইরে বেরিয়ে দুজন হাইড্ পার্ক কর্নারের দিকে হাঁটতে থাকে, হাইড্ পার্কে ঢোকে।

ডরোথিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অনুরাগ ভরে তাকে চুম্বন করে পিটার বলে— ডরোথি, আমরা কি চিরদিন একসঙ্গে থাকতে পারি না?

ডরোথি আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জবাব দেয়—এ কথার উত্তর আজকেই আমি দিতে পারি না; আর তা ছাড়া তুমি তো জানো আমি রোমান ক্যাথলিক।

পিটার উত্তেজিত হয়ে বলেছিল—ভিন্ন ধর্মমত চিরকাল মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ ঘটিয়ে এসেছে কিন্তু ধর্ম আর ধর্মের সংস্কার তো এক জিনিস নয় ডরোথি।

ডরোথি ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছিল—তুমি হয়তো প্রগতিবাদী কিন্তু আমাদের সমাজ প্রটেস্ট্যান্টদের স্বীকার করে না; আর তা ছাড়া—ডরোথি একটু ঢোক গিলে বলে—তা ছাড়া আমাদের যদি অনেক টাকা থাকতো তবে সমাজকে অগ্রাহ্য করে আমরা নিজেদের নীড় বাঁধতে পারতাম কিন্তু ছবি এঁকে অনেক টাকা হওয়া অসম্ভব যদি না অসামান্য প্রতিভা থাকে।

পিটার ক্ষুব্ধ হৃদয়ে মৌন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—হয়তো তোমার কথাই সত্যি ডরোথি, কিন্তু প্রেম বড় বেহিসেবী, তবু তার মধ্যেও যে হিসেব করে চলতে হয় আমার মোটা বুদ্ধিতে তা আসে না।

প্রায় নির্জন পার্কের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ওরা মার্বল আর্চে পৌঁছে যায়। ডরোথি বলে—এবার কিন্তু আমায় বাড়ী ফিরতে হবে, অনেক ধন্যবাদ একটি চমৎকার সন্ধ্যার জন্যে। পিটার মৃদু চাপ দেয় ডরোথির হাতে, রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলে—শুভরাত্রি ডরোথি।

বাসে চলতে চলতে ছোট বড় অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে, সবই যদিও নিছক আনন্দের নয় বেদনাও মিশে আছে তার সঙ্গে তবুও ডরোথি তার জীবনে নেই এ-কথা ভাবলে জীবন তার মিথ্যে বলে মনে হয়। ডরোথি রাগ করে চলে গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। তাকে দেখা করতে ডেকেছে—আশা ও আশঙ্কা পিটারের মনকে দোলায়। আজ সে ডরোথিকে কি বলবে যদি সে বলে তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে অর্থকরী অন্য কিছু কর। ছবি আঁকা ছেড়ে হয়তো তাকে মেসিনের সেলস্‌ম্যান হতে হবে অথবা ঐ রকমই অন্য একটা কিছু, কিন্তু তাহলে কি তার মন ভেঙ্গে যাবে না? ডরোথিকে পেতে হলে সে জন্যে তাকে মূল্য দিতে হবে অবশ্যই, কিন্তু কি সে দিতে পারে ডরোথিকে? ধর্মের গোঁড়ামিকে সে মানে না কিন্তু ধর্ম পরিবর্তনে তার ঘোরতর বিতৃষ্ণা। ছবি আঁকা তার নেশা, সে

ছবি নিয়েই জীবন কাটাতে চায়, অর্থের বাসনা তার নেই, যা দিয়ে সে অমৃতত্ব লাভ করতে পারবে না তাতে তার কি প্রয়োজন ?

সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে তা পিটার ভেবে স্থির করতে পারে না।

কেন্‌সিংটন গার্ডেন্‌সে পিটার ডরোথির সঙ্গে দেখা করলো। সম্ভাষণ জানাবার পরে পিটার সাগ্রহে ডরোথিকে কাছে টানতে চায়, ডরোথি সরে গিয়ে বলে—বসো পিটার, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কথা তো আছেই, অনেক কথা। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, জীবনটা যেন মরুভূমির মত নীরস হয়ে গিয়েছিল।

—কাব্য ছাড়ো পিটার, তোমার ছবি আঁকা কেমন চলছে ?

পিটার সাগ্রহে বলে—খুব ভালো, আমার নতুন ছবিগুলো তুমি দেখবে ? ভাবছি এবার সামার এগ্‌জিবিশনে একটা ছবি পাঠাব, সৌভাগ্যক্রমে যদি নির্বাচিত হয়, ভাবো ডরোথি, কি গৌরব, খ্যাতনামা চিত্রকরদের সঙ্গে স্থান পাবে আমারও ছবি।

পিটার উচ্ছ্বসিত হয়।

—তোমার কামনা সফল হোক্।—বলে ডরোথি নিরুত্তাপ কণ্ঠে।

পিটার বললো—চলো, একটু কফি খাওয়া যাক্।

বেজওয়াটার রোডের কোন কফি হাউসে ঢোকে দুজন, দেয়ালে আধুনিক চিত্রকলার পদ্ধতিতে ছবি আঁকা, পিটারের মন তাতে আকৃষ্ট হয়। ডরোথির কণ্ঠস্বরে তার ঘোর ভাঙ্গে, ডরোথি বলে—কফির সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আনতে বল পিটার।

খেতে খেতে পিটার বলে—কোন না কোনদিন আমি বড় চিত্রকর হবোই, তখন আর আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না।

ডরোথি বলে ফিস্‌ফিস্ করে—আমাদের নয়, বলো, আমার।

—আমাদের দুজনের পথ তো আলাদা নয়, তুমি কি আমাকে ভালবাসো না ডরোথি ?

ডরোথি মুখখানা নীচু করে, তারপর আস্তে আস্তে বাঁ-হাতের অনামিকা তুলে ধরে পিটারের চোখের সামনে, পিটার সবিস্ময়ে দেখে একটি হীরে-বসানো আংটি ঝক্‌মক্‌ করছে ডরোথির আঙুলে। সে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে, তার বাক্য-স্ফূর্তি হয় না, শেষে অতিকষ্টে বলে—কোন্ ভাগ্যবানকে তুমি সুখী করলে জানতে পারি কি?

ডরোথি উত্তর দেয়—আয়ার্ল্যাণ্ডের আমার এক বন্ধু, এখন অবশ্য আমার ফিয়াঁসে। অনেকগুলো রেস হর্সের মালিক।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পিটার বলে—ডরোথি, আমাদের ভালবাসা কি তবে ছিল অলীক স্বপ্ন?

উদাসস্বরে ডরোথি উত্তর দেয়—পিটার, তুমি বড় বেশী স্বপ্ন দেখো আর আমি অনেক বেশী বাস্তব।

॥ উনত্রিশ ॥

ডরোথি আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে গেছে। পামেলা পিটারের আহত মনকে সান্ত্বনা দিতে মাঝে মাঝে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। কিছুদিন পিটার তুলি বন্ধ করে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল, তারপর বেদনার যথার্থ অনুভূতি তাকে নতুন করে ছবি আঁকতে প্রবুদ্ধ করে। ব্যক্তিগত দুঃখের ছোট গণ্ডি থেকে মনকে মুক্ত করে নিয়ে সে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়, সব মানুষের হারানোর ব্যথাকে সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায়, বহু বিচিত্র তার রূপ, বহু বিচিত্র তার স্পর্শ। পিটার আশ্চর্য হয়, জীবনের বিস্তৃতি এমন! এখানে সে কত ক্ষুদ্র, তার দুঃখ কত ছোট! আঘাত দিয়ে ডরোথি তার মনের যে দুয়ার খুলে দিয়েছে হয়তো সেই দুঃখের আলোতেই সে শিল্পের যথার্থ রূপ দেখতে পাবে, বেদনার মধ্যেই হয়তো ওর শিল্পীজীবনের নবজন্মের উন্মেষ হবে। পিটারের মনে আছে, একদিন সুরঙ্গমা তাকে বলেছিল—পিটার, অবিচ্ছিন্ন সুখ মানুষকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে না, জীবনে দুঃখ পাবারও

প্রয়োজন আছে। যেমন অন্ধকার না থাকলে আলোর মর্যাদা বোঝা যেত না তেমনি দুঃখ না থাকলে সুখের স্বাদ পাওয়া সম্ভব হত না।

সুরঙ্গমার গভীর অন্তর্দৃষ্টি আশ্চর্য অভিভূত করেছিল পিটারকে। সুরঙ্গমা আরও বলেছিল, দুঃখ মানুষের পক্ষে জীবনরসায়ন, দুঃখের পোড় না খেলে জীবনের উপলব্ধি সত্য হয়ে ওঠে না পিটার।

পিটার ভাবে—এতদিন সে তুলি আর রঙ নিয়ে খেলা করছিল, এবার অনুভূতির গভীরে তাকে ডুবতে হবে। শিল্পীর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নেই, বিশ্বমানবের আনন্দ বেদনার সত্যরূপকে সে ছবিতে প্রাণ দেবে। মানবতার অবমাননায় জার্মানি অধিকৃত ফ্রান্সের তীব্র মর্ম-যন্ত্রণা পিকাসোর বিরাট অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল, সেই সার্থক সৃষ্টি, নিপীড়িত মানব আত্মার করুণ ক্রন্দনের রূপ পিটারের মানসচোখে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে ভাবে, এমনি করে বৃহৎ জীবনের সকল অনুভূতিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে সে ধন্য হবে। দুঃখকে তার ঐশ্বর্য মনে হয়।

মাঝে মাঝে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে পিটার পামেলার মুখের দিকে তাকায়, সে দৃষ্টি ভাসা ভাসা, মন তার ডুবে থাকে। পামেলা বুঝতে পারে সে জীবনে নতুন কিছু পেয়েছে, তার ধ্যান ভাঙ্গায় না।

নিজের কাজের অবসরে যতক্ষণ পারে পিটারকে সঙ্গ দেয় পামেলা, তার স্নিগ্ধ ব্যবহার পিটারের মনের ক্ষতের উপর যেন সান্ত্বনার প্রলেপ আনে, ধীরে ধীরে দিনে দিনে ওর দুঃখ প্রশমিত হয়ে আসে। কেমন করে ও পামেলাকে ভালবাসতে আরম্ভ করে তা বুঝতে পারে না কিন্তু পামেলাকে ওর বড় কাছের জন মনে হয়। এক সময় পিটারের মনে হয়, সে বুঝি তার সত্যিকার মানসীকে খুঁজে পেয়েছে। আজ সে শুধু সচিব এবং সখীই নয় তার ললিতকলাতেও অনুরাগিণী। ডরোথির রূপের আগুনে পুড়েছিল তার মন-ভ্রমরের পাখা কিন্তু সে ভ্রমর আজকের মত তো গান গেয়ে ওঠেনি। পিটার অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে পামেলার মুখের দিকে

তাকায়, দুহাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে আনে। পিটারের প্রতি যে প্রেম এতদিন পামেলার অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গোপন ছিল আজ পথ পেয়ে তা উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। জীবনবীণার তারগুলো ঝঙ্কৃত হয় সপ্তস্বরা হয়ে পিটারের আঙ্গুলের ছোঁয়ায়, পামেলা আত্মহারা হয়ে তার বাহুবেষ্টনে নিজেকে সমর্পণ করে।

ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেন্ট ধরে ধীরে ধীরে হাঁটছিল একটি মেয়ে, অনিশ্চিত উদ্দেশ্যহীন তার পদক্ষেপ। ডরোথি এসেছে আবার লণ্ডনে, পেগীর সঙ্গে তার বার্তা বিনিময় হয়েছে, জানতে পেরেছে পিটার আর পামেলার মধ্যে বাগ্‌দান হয়ে গেছে। জানে না কেন অসহনীয় ব্যথায় ডরোথির বুকটা টন্‌ টন্‌ করে ওঠে। পেগীর সঙ্গে দেখা করবার আমন্ত্রণ অস্বীকার করে পথে বেরিয়ে পড়ে ডরোথি।

চেয়ারিংক্রস্‌ টিউব স্টেশন পার হয়ে ক্লিওপেট্রা'স নিড্‌লের কাছে দাঁড়ায়, টেম্‌স্‌ নদীর অন্য ধারে আলোকোজ্জ্বল রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলের দিকে তাকিয়ে ব্যথায় মূক হয়ে যায় তার হৃদয়। প্রথম দিন যখন তারা দুজন একসঙ্গে বেরোয় কত স্বপ্ন ছিল পিটারের চোখে, বারে বারে নিষ্ঠুর হাতে তার স্বপ্নকে সে আঘাত করেছে, তবু পিটার কিছুতেই মুখ ফেরায়নি, আজ সে ফিরে গেছে। তার অকুণ্ঠ প্রেমের আত্মনিবেদন ডরোথির অবহেলার প্রাচীরে মাথা কুটেছিল ডরোথি ফিরেও চেয়ে দেখেনি। অনাদরে যে অমূল্য ধন সে হারিয়েছে জীবনে আর তা ফিরে পাওয়া যাবে না—ভাবতে ডরোথির মন হাহাকারে ভরে যায়। এই মুহূর্তে তার মনে হয়, তার মত নিঃস্ব দরিদ্র, তার মত দুঃখী জগতে আর কেউ নেই। ফেস্টিভ্যাল হলের উজ্জ্বল আলোগুলো তার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের সামনে ম্লান হয়ে যায়, ভাষাহীন বেদনার এক নির্বাক প্রতিমূর্তির মত সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ ত্রিশ ॥

অরিন্দমের অফিস ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো, রিসিভারটা কানের কাছে তুলে ধরতেই সে শুনতে পেল সুরঙ্গমা বলছে—আমি সুরঙ্গমা।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অরিন্দম বলে উঠলো—সুরঙ্গমা? তুমি আমাকে ডাকবে এ যে আশাই করতে পারিনি, কি যে ভালো লাগছে! খবর কি, এসো কাজে ফাঁকি দিয়ে একটু গল্প করা যাক। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই, কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছি না, মন বড় খারাপ।

সুরঙ্গমা হেসে ফেললো—উঃ এক নিঃশ্বাসে কতগুলো কথা বলে ফেললে বল তো? শোন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে, এখানে সরস্বতী পুজো হচ্ছে, তোমার আসা চাই। চাই কি তুমি রাজী হলে পুরোহিতের গৌরবজনক পদটা তোমাকে পাইয়ে দিতে পারি।

অরিন্দম বলে—তাতে আপত্তি নেই কিন্তু তসরের ধুতি নামাবলী এসব পাবে কোথায়? এই সব টিপিক্যাল পুরোহিতের পোশাক না হলে আমাদের প্রাচ্যদেশের বাগ্‌দেবীর পুজো করা চলে না, পশ্চিমের সরস্বতীকে করা চলে।

—যে দেশের যে আচার, এখানে প্যাণ্ট কোট পরে পুজো করলেও ক্ষতি হবে না। আচ্ছা, আস্‌ছ তো? ফাঁকি দিও না লক্ষিটি।

এর একটু পরেই কৃষ্ণরাওয়ের ফ্ল্যাটে ফোন বেজে উঠলো। জিন্ বললো—ব্যাপারটা কি সুমি বলতো? বহুদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই, করছ কি তুমি এত, বল দেখি?

—বাঃ আমার বুঝি কাজকর্ম নেই কিছু, বেকার বসে আছি না? বড় পড়াশোনার চাপ পড়েছে ভাই, তা ছাড়া প্র্যাকৃটিক্যাল কাজও

আছে। আমাকে না দেখতে পেয়ে আর এক জনের শুনছি চোখে নাকি ঘুম নেই, মন খুব খারাপ।

জিন্ হেসে ফেললো—সত্যি? তা এমন যখন অবস্থা তখন ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা না করলে কি করে চলবে বল?

সুরঙ্গমাও হেসে ওঠে, তারপর বলে—তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। এখানে সরস্বতী পুজো হচ্ছে, ইনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের বিদ্যার দেবী। এই উৎসবে ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা অনেকে আসবে। নাচ গান আবৃত্তি বক্তৃতা অনেক কিছু হবে।

—তোমায় খুব উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছে। এত খুশীটা কিসের?

—জানি না, কিন্তু কেন যেন সব ভালো লাগছে। আকাশ, বাতাস, আলো, মানুষ সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেন ভালো লাগছে, এমন ভালো অনেকদিন লাগেনি।

জিন্ প্রশ্ন করলো—অরিন যাচ্ছে নাকি?

সুরঙ্গমা উত্তর দিলো—হয়তো। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

—তোমার সমস্ত পৃথিবীটাকে ভালো লাগার কারণ আবিষ্কার করতে, এখন বুঝতে পারছি কেন ভালো লাগছে। যে দিন বর্ডারে সাল্যাভ পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলে সেদিন থেকেই বোধহয় তোমার আকাশ পৃথিবী সব কিছুকেই ভালো লাগছে, না?

সুরঙ্গমা সকৌতুকে প্রশ্ন করে—কি করে জানলে?

জিন্ বলে—তোমার মুখ দেখে।

দুদিক থেকে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অরিন্দমকে ভাবে সুরঙ্গমা। গোপন ঐশ্বর্যের মত অরিন্দমের স্পর্শসুখকে উপভোগ করে মনের মধ্যে; সুখের আবেশে বুক ভরে যায়। দুরন্ত ও সত্যিই, নিবিড় আগ্রহে হাত চেপে ধরে, অসঙ্কোচে কোমর জড়িয়ে কাছে টেনে নেয়, বিপুল আবেগে মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে, অধরের স্পর্শ কি নিবিড়! কল্পনায় উপভোগ করে সুরঙ্গমা, মদির আবেশে দুই চোখ বুজে

আসে, রাত্রের অন্ধকারে বিছানার মধ্যে সুরঙ্গমার সমস্ত দেহে রোমাঞ্চ জাগে।

দুর্দম প্রপাতের মত ও যেন দুরন্ত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার প্রাণের উপলখণ্ডগুলোর ওপরে, জলের তোড়ে চঞ্চল হয়ে রিণঝিন করে বেজে উঠছে পাথরগুলো। ওর প্রেমের প্লাবন হয়তো সত্যিই সুরঙ্গমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। দুঃসাহসী ও, স্বীকার করছে—ওর ভেতরের প্রবল আবেগকে ও সংযত করতে পারছে না তবু সুরঙ্গমা যেন ওকে ক্ষমা করে। ভাসতে কি সুরঙ্গমা সত্যিই চায়? বাধা কি?

অজানিতে কখন সন্তর্পণে শুভেন্দু এসে মনকে অধিকার করেছে তা সে বুঝতে পারেনি। প্রশান্ত শুভেন্দু, প্রশান্ত তার দৃষ্টি, অচঞ্চল তার হৃদয় হ্রদের মতো নিস্তরঙ্গ, ভালবাসায় তার গভীর সমুদ্রের প্রশান্তি। উচ্ছ্বাস নেই একবিন্দু তবু তো তাকে একেবারে অতলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আজও কি সেই অকুল পাথার থেকে সে উঠতে পেরেছে তীরে? হয়তো পারেনি।

ছট্‌ফট করে বিছানায় উঠে বসে সুরঙ্গমা—না, না, না, শুভেন্দু তার কেউ নয়, কেন সে তার মনের দুয়ারে বারে বারে হানা দেয়? তাকে সে ভাবতে চায় না তবু কেন সে ভাবনায় জড়িয়ে থাকে?

ভুলতে চায়, শুভেন্দুকে সে নিশ্চিহ্ন করে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, তবু কেন তাকে মুছে ফেলা যায় না?

॥ একত্রিশ ॥

লণ্ডনে সরস্বতী পূজাকমিটির সভানেত্রী ইন্দ্রাণী সরকার বাঙ্গালী ছাত্রদের ইন্দ্রাণীদি। পাতলা ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণা মেয়েটি, বয়স বোধহয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে, ভাসা ভাসা চোখ দুটি সব সময় হাসতে থাকে। কেউ তার সঙ্গে রসালাপ করবার সাহস পায় না,

তার ব্যক্তিত্ব ওদের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে, বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সকলেই তাকে ভালবাসে।

লণ্ডনের সেমুর হলে এবার সরস্বতী পূজা হচ্ছে। প্রতি বছর পটেই দেবীকে অর্চনা করা হয়। এবার দেশ থেকে বন্ধুবান্ধবেরা শ্বেত পাথরের ছোট্ট সরস্বতী মূর্তি পাঠিয়েছে, তাই ছেলেমেয়েদের ভারি আনন্দ। সকাল বেলাতেই তারা সব পুজোর জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। ছেলেরা ফুলপাতা দিয়ে ঘর সাজাচ্ছে, মেয়েরা ফুল দূর্বা চন্দন গুছিয়ে রাখছে, ফল কেটে থরে থরে সাজিয়ে রাখছে। পুরোহিত এসেছেন, পুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ইন্দ্রাণী ও তাঁর স্বামী কল্যাণ সরকার অনেক আগেই এসেছেন, কল্যাণ সরকার পূজা কমিটির সম্পাদক, পাড়ার ডাক্তারও।

ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রাণীদিকে ঘিরে ধরতেই তিনি বললেন—নতুন নতুন ভাইবোন যারা এ বছর এদেশে এসেছে আগে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।

অরিন্দম আর সুবঙ্গমা এগিয়ে এলো। অরিন্দমকে দেখেই ইন্দ্রাণী বলে উঠলেন, ও, ইউ আর অরিন্দম! নটি বয়, কোথায় পালিয়েছিলে এতদিন, সমুদ্রের জলে?

অরিন্দম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট নিয়েছিল। দেশ থেকে এসে প্রথম প্রথম যখন ঘর-ছাড়া মন কিছুতেই বিদেশে বসতে চায়নি, আত্মীয় স্বজনের জন্যে ভয়ানক মন কেমন করতো তখন ইন্দ্রাণীদির স্নেহই ওর মনকে আশ্রয় দিয়েছিল। ইন্দ্রাণীর পনের বছরের লণ্ডন-জীবনে ঘর-ছাড়া অনেক প্রবাসী ছেলেই তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের ছায়ায় মনকে শান্ত করেছে। অরিন্দম বললো—আমার অপরাধ হয়ে গেছে ইন্দ্রাণীদি, বহুদিন আপনার কাছে আসিনি। বছর দুই হল জেনেভাতে ইণ্ডিয়ান কনস্যুলেটে কাজ নিয়েছি।

ইন্দ্রাণীদি খুশী হয়ে বললেন—বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ কোরো, বান্ধবীর খাতিরে যেন কাজে ফাঁকি দিও না।

হাসিমুখে সুরঙ্গমার দিকে চাইলেন তিনি, অরিন্দম হেসে ফেলে।

হাত বাড়িয়ে সুরঙ্গমার হাতখানি ধরে ইন্দ্রাণী বলেন—আমার এই বোনটি ?

অরিন্দম উত্তর দেয়—ইনি সুরঙ্গমা মিত্র, লণ্ডনে ডাক্তারি পড়তে এসেছেন, কলকাতা থেকে এসেছেন ইনি।

সুরঙ্গমার পিঠে হাত রেখে সস্নেহে ইন্দ্রাণীদি বললেন—লণ্ডনে তোমার ভাল লাগছে তো ? যখনই মন কেমন করবে ইন্দ্রাণীদির কাছে বেড়াতে এসো, কেমন ?

সুরঙ্গমা একটুখানি হাসলো। এই অন্তরঙ্গতাই তাঁকে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের প্রিয় করেছে। তিনি যখনই বাড়ীতে রসগোল্লা কি ছানার পায়েস করেন, টেলিফোন করে যাকে হাতের কাছে পান তাকেই ডেকে খাওয়ান। বললেন—ভাইবোনেরা, আজ রাত্রে তোমরা সবাই আমার বাড়ীতে পুজোর প্রসাদ খেতে যাবে কিন্তু।

লণ্ডনে যদিও বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে মোগলাই পরেটা আর মাংসের কারী খেয়ে মাঝে মাঝে মুখ বদলায় তবু সরস্বতী পুজোর রাত্রে ইন্দ্রাণীদির রান্না খিচুড়ী আর সরষের তেলে আলু ভাজা, আলুর দমের মধ্যে বাংলার ছেলেমেয়েরা দেশের রান্নাঘরের পরিবেশকে ফিরে পায়। ওই খিচুড়ী আর আলুর দম তাদের মুখে আর মনে অমৃত পরিবেশন করে। ইন্দ্রাণীদির বাড়ীতে সরস্বতীর প্রসাদ পাবার নেমন্তন্ন ওদের প্রতি বছরই থাকে। ছেলেমেয়েদের হৈ হল্লাতে ইন্দ্রাণী সরকারের ফ্ল্যাটটি যখন মুখরিত হতে থাকে পাশের প্রতিবেশী ফ্ল্যাটগুলির অধিবাসিনী বিদেশিনীরা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে, ভাবে—এরা অকারণে এত চেঁচায় কেন ? বাঙ্গালী জাতির স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে তাদের তো কোন অভিজ্ঞতা নেই।

॥ বত্রিশ ॥

অমিতা মাঝে মাঝে শুভেন্দুর কাছে তার শারীরিক কুশল প্রশ্ন করে চিঠি লেখে। শুভেন্দু আর সুরঙ্গমার বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ সে নিজের মধ্যে সকল সময় সকল কাজে বহন করে। এমন সুন্দর দুটি জীবন সৃষ্টিকর্তার কোন্ অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করতে এমন করে অসার্থক হয়ে গেল তা ভেবে কূল কিনারা পায় না।

শুভেন্দু জানায়, সে খুব ভাল আছে, আনন্দে আছে, অমিতা যেন তার জন্যে ভাবনা না করে। অমিতা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। শুভেন্দুকে লেখে—দুঃখকে একান্তভাবে তোমার নিজের ধন করে তুলো না শুভেন্দুদা, আমাকেও তার অংশভাগী হতে দাও, তা হলেই দুঃখকে বহন করা সম্ভব হয়, সে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।

শুভেন্দু উত্তর দেয়—তুমি ভুল বুঝেছ অমিতা, আমার সত্যকেই আমি তোমার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। যদি গোপন করতে চাইতাম তবে এক সময় তোমার কাছেই আমার জীবনের পরম দুঃখকে তুলে ধরেছিলাম কেন? সে দিন তো এতটুকু গোপন করিনি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি আনন্দে আছি, শান্তিতে আছি, যদি পার একবার এসে দেখে যেও।

—আজ বুঝতে পেরেছি গোটাকতক মন্ত্র পড়ে যে বিয়ের বন্ধন ঘটে তাতে একজন মানুষের ওপর আর একজনের প্রভুত্ব করবার কোন স্বত্ব জন্মায় না। মানুষ স্বাধীন, পলে পলে সে নিজের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করে নতুন করে, অন্যের ইচ্ছার দাস সে নয়, কর্তৃত্বের অহঙ্কারে আমরা সে কথা মনে রাখিনে, উদারতা হারাই। সমাজ, সংস্কার আমাদের মনের হাত পা বেঁধে রেখেছে তাই আমরা নতুন কিছু ভাবতে সাহস পাইনে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর স্বত্বের অন্ধ

অভিমানবশে সুরঙ্গমার ওপর অত্যাচার করেছিলাম, জীবন থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আজ আমি নিজেকে বিচার করছি, বুঝতে পারছি কত বড় ভুল করেছিলাম।

—সুরঙ্গমা আজ স্বাধীন, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ পদে পদে কারু কাছে জবাবদিহি করতে মাথা নীচু করে না। বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হয়তো সে সুখী হয়েছে। সেই কথা ভেবে আমিও সান্ত্বনা লাভ করেছি, বিচ্ছিন্ন হবার ছুঃখ আর আমাকে আজ বেদনা দেয় না।

অমিতা এ-চিঠির উত্তরে লিখলো—শুভেন্দুদা, দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে তুমি নিজের যে বিচার বিশ্লেষণ করেছো তাকে আমি মেনে নিতে পারলাম না। তুমি নিজেকে অযথা ছোট করছ। সুরঙ্গমার ওপর তুমি যে জোর খাটিয়েছিলে তা সম্পত্তির ওপর প্রভুর অধিকারে নয়, সে তোমার অপরিসীম ভালোবাসার অধিকারে, সে-কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। আমরা শীগগিরই তোমার কাছে যাচ্ছি, স্টেশনে বন্দোবস্ত রেখো।

সুচিকিৎসার অভাবে গ্রাম্য লোকের অবর্ণনীয় ছুর্দশা শুভেন্দুর মনকে পীড়িত করেছিল। মানুষের ছোটবড় সব রকম ছুঃখই আজকাল তার মনকে বড় বেশী অভিভূত করে। প্রথম অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে সে শহর থেকে দূরে একটি ডাক্তারখানা খুলেছিল। সেখানে তিনটি শয্যাস্থাপনও করেছিল কিন্তু অভাবের তুলনায় তা কিছুই নয়। তারপর ছু'বছরের অক্লান্ত চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অমানুষিক পরিশ্রমে আজ সে সরকারের এবং জনসাধারণের আনুকূল্যে পঞ্চাশ একর জমি নিয়ে এক বিরাট হাসপাতালের সূচনা করেছে। এখানে এখন পঁচিশটি শয্যা, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থার ত্রুটি নেই।

কুশল আর অমিতা তা দেখে দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হল। কুশল বললো—একি অসম্ভব ব্যাপার তুমি করেছ শুভেন্দু, এত কম সময়ের মধ্যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা যে কল্পনাও করা যায় না, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছ নাকি ?

হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে সুরকির লাল রাস্তার দুধারে দেবদারু গাছগুলি বড় হয়ে উঠছিল তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুভেন্দু হাসিমুখে উত্তর দিল—এখনও অনেক কিছু বাকি আছে ভাই, তবে একটা সুখের কথা, এখানে ডাক্তার নার্স যাঁরা কাজ করছেন সকলেই স্বেচ্ছাব্রতী। এঁদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একদিন এখানকার চাহিদা আমরা মেটাতে পারব আশা করছি।

অমিতা কোন কথা বলে না। সে জানে—এ ওর প্রেমের তাজমহল, এই তাজমহল গড়ার কাজে আত্মোৎসর্গ করে পরম ব্যথার মধ্যে সে জীবনের অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে।

একটি নিম্নশ্রেণীর মেয়ে দরজার আড়াল থেকে অনুচ্চস্বরে সংবাদ দিয়ে গেল, খাবার তৈরী হয়েছে।

কুশলকে দেখতে না পেয়ে শুভেন্দু বললো—কুশল কোথায় গেল ?

—তোমার হাসপাতাল একটু ঘুরে দেখতে গেছে, এখনি আসবে। ও মেয়েটি কে শুভেন্দুদা ?

শুভেন্দু বললো—ওর নাম কুস্‌মী, দেহাতী মেয়ে। চরিত্রহীনা বলে ওর গ্রামসমাজ ওকে বর্জন করেছে। ওর মা মরে যেতে আজ ও অসহায়।

—তোমার মত আশ্রয় থাকতে ও অসহায় কেন হতে যাবে শুভেন্দুদা।

—সত্যি কথা অমিতা, দুষ্টুলোকের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবার জন্যে ওকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। লোকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ও নিরুপায় অবস্থায় আমার কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করে বলেছিল,

ওকে হাসপাতালের ঝাড়ুদারণীর কাজ দেওয়া হোক আর হাস-পাতালের এক কোণে ওকে মাথা গোঁজবার একটু জায়গা দেওয়া হোক। ওকে এখানেই স্থান দিয়েছি।

অমিতা একটু হেসে বলে—বুদ্ধিমতী মেয়ে, ঠিক জায়গাটাই খুঁজে বার করেছে, বিন্দুমাত্র ভুল করেনি।

শুভেন্দু বলে—শ্রদ্ধা নিয়ে চেষ্টা করলে যে মানুষের ভেতরকার সত্যি মানুষটিকে জাগানো যায় তা আমি ওর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। ওর ছোঁয়া খাবার আমাকে দিতে ওর অপরিসীম কুণ্ঠা, গ্রামের লোকে ওর হাতের ছোঁয়া খায় না, আমি ওর হাতে খেয়েছি তাতে ও কৃতার্থ হয়ে গেছে। সেবার মধ্যে দিয়ে আজ ও নিজেকে ফিরে পেয়েছে। ওর সেবাকে এগিয়ে দিয়ে ও অন্তরালে থাকে।

অমিতা শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। একটু পরে বলে—শুভেন্দুদা, তুমি দেবতা!

—না বোন, আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ।

শুভেন্দু একটু ম্লান হাসি হাসে। দূরে, বহুদূরে দিগন্তে যেখানে বনানীর শ্যামলতা নীল আকাশের গায়ে মিশেছে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে—সুরঙ্গমাকে হারিয়ে আমি সত্যকে উদ্ঘাটন করার দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছি অমিতা, বড় ব্যথার মধ্যে দিয়েই মানুষ এমনি করে সত্যকে খুঁজে পায়। আমরা ভুলে যাই, যাকে আমরা অন্যায় বলে ধরে থাকি সেটাই মনের যথার্থ রূপ নয়, সেটা সাময়িক বিকৃতি, আমরা গতানুগতিক ভাবে চিন্তা করি, বিচার করি, শাস্তির বিধান দিই। এ-কথাটা মনে থাকে না যে তিরস্কার পুরস্কারের বিধান দেবার আমাদের অধিকার নেই, তা ছাড়া কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তার চরম মীমাংসা করবার মত জ্ঞানও আমাদের আছে বলে মনে হয় না।

একটুখানি চুপ করে থেকে হঠাৎ সচেতন হয়ে বলে ওঠে—কুশল কোথায় গেল, ওকে দেখছিনে তো, চল খেতে যাই।

শুভেন্দুর জন্যে কুস্‌মীর অনলস সেবাপরায়ণতা অমিতাকে মুগ্ধ করে। অযোগ্যতার লজ্জা নিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকে ও, সহজে নিজেকে প্রকাশ করে না, শুধু ওর যত্নের ছোঁয়াটুকু সব জায়গায় লেগে থাকে। কুস্‌মীর রান্নাঘরে ঢুকে অমিতা দেখেছিল স্নানশুচি হয়ে একাগ্র নিষ্ঠায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রান্না করছে সে, যেন দেবতার ভোগের অন্ন প্রস্তুত করছে। অমিতার প্রশ্নে সে তন্ময়তা ভেঙ্গে সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার দেহাতী হিন্দীতে অমিতার প্রশ্নের যতটুকু উত্তর দিয়েছিল তাতে অমিতা বুঝতে পেরেছিল, ডাগ্‌দার সাব কৃপা করে তার হাতের সেবা নিয়েছেন তাতে সে ধন্য হয়েছে। পাথরের দেবতা মানুষের সেবা নেন কি না তা চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার প্রত্যক্ষ দেবতা তার সেবাকে গ্রহণ করেছেন এর চেয়ে আর কিছু তার কামনার নেই।

বর্ণজ্ঞানহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরিত্রহীনা এক গ্রাম্য মেয়ে তার সংস্কারের মহিমায় অপূর্ব হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল সেদিন অমিতার চোখে।

শুভেন্দুকে ও বলে—শুভেন্দুদা, একি নিষ্কাম সাধনা ওর, এমন মেয়েকে আমি না দেখলে ধারণা করতে পারতাম না। তোমার মধ্যে ও নিজেকে একেবারে লোপ করেছে একি অদ্ভুত ক্ষমতা ওর।

আশ্চর্য হয়ে অমিতা ভাবে, একটি মানুষ জীবনের উত্তাপে দগ্ধ হয়ে এসে শান্তি বারির সেচনে স্নিগ্ধ হয়েছে তার হাত দিয়ে, কুস্‌মীর এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। যে সৌভাগ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আভিজাত্যে সম্পন্ন সুরঙ্গমার জীবনে ঘটলো না সেই দুর্লভ গৌরবের অধিকারিণী হল এক অনভিজাত কন্যা আর তার মধ্যে প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজে পেয়ে বিংশ শতাব্দীর এক উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান পুরুষ সান্ত্বনা লাভ করলো!

অমিতা বলে—শুভেন্দুদা, কুস্‌মীর সৌভাগ্যকে আমার হিংসে হয়। তোমার এই আশ্রমের পবিত্র হাওয়া, তোমার সেবার অধিকার

ওকে শুদ্ধ করেছে, পবিত্র করেছে। তোমার এই আশ্রমের এক প্রান্তে আমারও থাকতে ইচ্ছে করে শুভেন্দুদা।

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলে—না দিদি, তোর এখানে স্থান হবে না। তোরা দুজনে গড়বি গার্হস্থ্য আশ্রম, বনস্পতির মত পথচারীকে আশ্রয় দেবে, ছায়া দেবে, সেই শান্তি-ঘন ছায়ায় আমার মত রৌদ্রতপ্ত পথিক দু দণ্ডের আশ্রয়ে তৃপ্ত হয়ে যাবে তোদের কাছ থেকে। আমি গার্হস্থ্য আশ্রম গড়তে পারিনি, নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলেছি, তোদের মধ্যে দিয়ে আমার সে কামনা পূর্ণ হোক্।

অমিতা জলভরা দুইচোখ নামিয়ে নেয়, শুভেন্দুর উদাস দুই-চোখের দৃষ্টি আবার সেই দূর দিগন্তে হারিয়ে যায়।

॥ তেত্রিশ ॥

কল্পনায় নীড় বাঁধার স্বপ্ন। সাল্যাভ পাহাড়ে দুজন পাশাপাশি ঘন হয়ে বসেছে। সুরঙ্গমার হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে অরিন্দম বলে—সু, সুরঙ্গমা, তোমার পড়ার কোর্স শেষ হলে আমরা ভারতে চলে যাব, কলকাতায় গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে। আমার বাবা মা তোমার জন্যে আশা করে আছেন।

সুরঙ্গমা হাসিমুখে বলে—তাঁরা আমার কথা কি করে জানলেন?

খুশীভরা গলায় অরিন্দম উত্তর দেয়—আমি লিখেছিলাম, তাঁরা ভয়ানক খুশী হয়ে সমর্থন জানিয়েছেন। বাবা কি লিখেছেন শুনবে?

—কি লিখেছেন?

—বাবা লিখেছেন ব্যারিস্টার পুরঞ্জয় মিত্রের মেয়ে তো আমাদের ঘরের মেয়ের মত, সে আমাদের ঘরে এলে আমরা পরম সুখী হব।

সুরঙ্গমা পুলকিত হয়।

অরিন্দম বলে—দেখো সুরঙ্গমা, আমার বাবা মার আমি একমাত্র ছেলে, আমাকে দিয়ে তাঁরা সুখী হন এই আমার আকাঙ্ক্ষা। অনেক দিন থেকে আমার ফিরে যাবার পথ চেয়ে ওঁরা ব্যাকুল হয়ে আছেন কিন্তু তোমাকে এখানে রেখে তো আমি যেতে পারব না তাই তোমার কথা তাঁদের জানিয়েছি।

সুরঙ্গমা হেসে বলে—তাঁরা হয়তো ভাবছেন তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

অরিন্দম হেসে ওঠে, বলে—তা যদি ভেবে থাকেন তবে খুব বেশী ভুল করেননি, তুমি সত্যি আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছো সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা মুখ টিপে হাসে, তারপর চুপি চুপি বলে—আর তুমি ?

গাঢ় অনুরাগে অরিন্দম সুরঙ্গমার মুখখানি তুলে ধরে তাতে চুম্বন এঁকে দেয়। একটু পরে বলে—আমার বাবা মা প্রাচীনপন্থী, রেজিস্ট্রী করে বিয়ে তাঁরা পছন্দ করবেন্ না, শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী করে হিন্দুপ্রথামতে আমাদের বিয়ে হবে এটাই তাঁরা চান, আমার নিজেরও তাই ইচ্ছে। সুরঙ্গমা একটু কেঁপে ওঠে। শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী করে শুভেন্দুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, কুশণ্ডিকার সময় অগ্নিদেবতাকে সম্মুখে রেখে প্রতিজ্ঞা করে তাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেছিল শুভেন্দু।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর সুরঙ্গমা বলে—কিন্তু তোমার বাবা মা আমায় প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন তো ?

অরিন্দম হেসে উঠলো—তোমার মনে এ সন্দেহ কেন এল বলতো ? আমার বাবা মাকে তো আমি জানি তাঁরা প্রাচীনপন্থী হলেও অনুদার নন কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করবার পক্ষে তাঁদের আপত্তির কোন কারণও দেখছিনে তো।

সুরঙ্গমা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে তারপর জোর দিয়ে বলে —আমি তো কুমারী নই, আমার যে বিয়ে হয়েছিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ভয়ানকভাবে চমকে ওঠে অরিন্দম—তু-তুমি বিবাহিতা?

মাথা নীচু করে সুরঙ্গমা জবাব দেয়—হ্যাঁ, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

নিজেকে সামলাতে খানিকটে সময় নেয় অরিন্দম, তারপর নির্জীব কণ্ঠে বলে—আমায় এতদিন্ এ কথা বলনি কেন?

বিস্মিত ও ক্ষুণ্ন হয় সুরঙ্গমা, বলে—তোমাকে এ কথা বলবার প্রয়োজন মনে করিনি।

—প্রয়োজন ছিল বইকি, গোপন রেখে খুবই অন্যায় করেছ। —অরিন্দমের কণ্ঠস্বর রূঢ় শোনায়।

সুরঙ্গমার মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে, বলে—আমার ক্ষেত্রে তোমার পক্ষে কি আমিই একমাত্র সত্য নই, আমার অতীত জীবনের জন্যে তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে? ভেবেছিলাম তুমি শিক্ষিত, আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাকে তুমি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছ, এতদিন এদেশে থাকার পরও যে তোমার মন সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি এটা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি অরিন্দম।

অরিন্দম শূন্য দৃষ্টিতে দূরে চেয়ে থাকে, সেখানে তার কল্পনার সৌধ থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে তারপর কাতর কণ্ঠে বলে—সুরঙ্গমা, কেন তুমি এতদিন এ কথা জানাওনি? কেন এতদূর এগিয়ে যেতে দিলে আমার আশাকে, আমার ভালবাসাকে? আমি যে তোমাকে অনাঘ্রাত ফুল ভেবেছিলাম।

সুরঙ্গমার উত্তেজনা এবারে একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়, সে ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয়—তোমার মন যে এত দুর্বল তা আমি জানতাম না অরিন, আমি ভেবেছিলাম আমি নতুন হয়ে তোমার জীবনে এসেছি তুমি আমায় আগ্রহে গ্রহণ করবে।

—কিন্তু, কিন্তু তুমি তো জানতে আমার বাবা মা আছেন। কুমারী জেনেই তাঁরা তোমাকে নিতে চেয়েছেন, তোমার বিয়ে

হয়েছিল জানলে কখনই রাজী হবেন না। তাঁদের কাছে তো আমি কিছুতেই সত্য গোপন করতে পারব না, আমি কেমন করে এখন এ কথা তাঁদের জানাব?

সুরঙ্গমা বললো—তুমি যদি আমাকে নাও তোমার বাবা মা কি আমাকে নিতে পারবেন না?

অরিন্দম নির্বোধ চোখে সুরঙ্গমার দিকে চেয়ে থাকে। সুরঙ্গমা জবাব না পেয়ে আবার বলে—আর যদি তাঁরা আমাকে গ্রহণ না-ই করেন আমরা দুজন আলাদাভাবে থাকবো।

অরিন্দম এবার উদাসস্বরে জবাব দেয়—তা হয় না সুরঙ্গমা, আমি আমার বাবা মাকে দুঃখ দিতে পারবো না, তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমিও সুখী হতে পারবো না। আর তাছাড়া—তাছাড়া ভারতবর্ষের কোর্টে তোমাদের বিচ্ছেদের মামলা তোমার নামের ওপর কতখানি কালি ছিটিয়েছে তাও তো আমার জানা নেই, জানি না ভবিষ্যতে সে কালি আমার মুখকেও কালো করে দেবে কি না, হয়তো সেটা সহ্য করতে পারবো না।

সুরঙ্গমা আহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বলে—কেন আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে কথা কি তুমি জানতে চাও? তুহিনশীতল কণ্ঠস্বর সুরঙ্গমার।

অরিন্দম কথা বলতে পারে না, তার গলা বুজে আসে দারুণ ভয়ে। না জানি আরও কি ভয়ানক কথা সুরঙ্গমার জীবনে আছে, যা এক মুহূর্তে তার স্বপ্নসাধকে, সমস্ত আনন্দের কল্পনাকে ধুলিঝঞ্ঝায় অন্ধকার করে দিয়ে যাবে! কিন্তু, কিন্তু, সবিস্ময়ে অরিন্দম নিজেকে প্রশ্ন করে, তার স্বপ্নসাধ তার সুখের আশা এখনও কি মনের নিভৃতে বেঁচে আছে তাই এই ভয়? আরও বিস্ময়ে সে অনুভব করে সুরঙ্গমার ভালবাসাকে আশ্রয় করে যে স্বপ্নকে সে বুকের তলে রচনা করেছে, সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে সে আর বাঁচতে পারবে না। কিন্তু, তবু, তবু তার বুকের মধ্যে কিসের এ যন্ত্রণা, তার বুককে কুরে কুরে খাচ্ছে

যেন কোন এক বিষাক্ত কীট যাকে সে কিছুতেই সরাতে পারছে না। সুরঙ্গমার বিয়ে হয়েছিল, তার স্বামীর সঙ্গে সে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিল, অনেকগুলো দিন তাদের অনুরাগে মধুর হয়েছিল, অনেক রাত্রি তাদের দুজনের নিবিড় মিলনে উত্তপ্ত প্রগাঢ় ছিল সেই সুরঙ্গমাকে সে কুমারী ভেবে তার একনিষ্ঠ প্রেমকে উৎসর্গ করেছিল! সেই সুরঙ্গমাকে—সম্ভুক্ত তার দেহ, উচ্ছিষ্ট তার প্রেম, সেই সুরঙ্গমাকে সে কেমন করে তার জীবনে, তার প্রেমের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবে?

পরস্পর-বিরোধী চিন্তার সংঘাত অরিন্দমের মস্তিষ্ককে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে সহসা সে সচেতন হয়, সুরঙ্গমা বলে—আমার জীবনকে অকপট করতে চাই তোমার কাছে অরিন্দম!

অরিন্দম অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সুরঙ্গমা অকম্পিত স্বরে বলে যায়—আমার স্বামী আমার চরিত্রে সন্দেহ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান, যদিও আমার একনিষ্ঠ ভালবাসায় একবিন্দু ভেজাল ছিল না। সব কথাই আজ তোমার কাছে খুলে বলতে চাই, সে অনেক ব্যথার কথা, শোনার ধৈর্য থাকবে কি তোমার?

সুরঙ্গমার মুখের ওপর থেকে অরিন্দমের দৃষ্টি বহুদূর দিগন্তে চলে গেছে। সেখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তার আশার প্রাসাদ চূরমার হয়ে যাচ্ছে, খিলানের জোড় খসে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে গম্বুজ, ধসে পড়ছে তোরণ, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে অপূর্ব এক সৃষ্টি। ভীতি-কণ্টকিত অরিন্দম নিষ্পন্দভাবে বসে থাকে।

এর পর সুরঙ্গমাকে আর সে দেখা দেয়নি। সুরঙ্গমা লণ্ডনে চলে গেছে অনেক দিন, অরিন্দম আর সেখানে যায় না। জেনেভাতে কৃষ্ণরাওয়ের ফ্ল্যাটেও আর সে আসে না। সুরঙ্গমা অধীর হয়ে ওঠে, অরিন্দমকে দেখার তৃষ্ণায় তার আকণ্ঠ শুকিয়ে গেছে, অসহনীয়

ব্যাকুলতায় দিন যায়। নিশীথ রাত্রে চোখের জলে বালিস ভেজে, দিন আর কাটে না।

স্থরঙ্গমা যখন ভালবাসে, নিজেকে নিঃস্ব করে উজাড় করে অজস্র করে ঢেলে দেয় সে, নিজের বলতে আর এতটুকু হাতে রাখে না, এই তার প্রকৃতির ধর্ম। আত্মহারা হয়ে শুভেন্দুকে ভালবেসেছিল তাই আঘাত যখন এল তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। চোখের জলের অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতি লোপ পেয়েছিল তার কাছে, লুটিয়ে পড়েছিল ধুলোর তলে; অনেকদিন পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পারেনি। আর আজ আর একবার অমনি করেই নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে অরিন্দমের ভালবাসার কাছে। তুঃসহ হয়েছে তার অদর্শন, কি করবে স্থরঙ্গমা ভেবে পায় না। মন চায় নারীর আত্মমর্যাদা নায়িকার অভিমান সব কিছু বিসর্জন দিয়ে পুরুষের কাছে নতি স্বীকার করতে, তাকে কাছে ডাকতে, তার বুকে মাথা রাখতে। কিন্তু অরিন্দম কেমন করে তাকে এমন করে ভুলে গেল যে, একবার চোখের দেখা দিতেও এল না, সেও তো স্থরঙ্গমাকে ভালো-বেসেছিল।

॥ চৌত্রিশ ॥

মানসিক বিপ্লবে বিধ্বস্ত অরিন্দম একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, আর সে কাজ করতে আসছে না। কৃষ্ণরাওয়ের সঙ্গে আর তার দেখা হয় না। দিনরাত মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব নিয়ে সে অস্থির হয়ে আছে। একবার ভাবে স্থরঙ্গমা যাই হোক, কলঙ্ক তার সত্যি হোক মিথ্যে হোক তাকে সে কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারবে না, জীবন তা হলে তার মিথ্যে হয়ে যাবে। পর মুহূর্তেই মনের ভেতর থেকে আর একজন প্রশ্ন করে, কিন্তু তোমার মনের দ্বিধা? এর পরেও কি স্থরঙ্গমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে? তার

সঙ্গে যদি মিথ্যাচরণ করতে হয় সে দুঃখ কি দুঃসহ হবে না ? আরও সন্দেহ হয় সুরঙ্গমার ভালবাসা কি অকৃত্রিম ? বিরুদ্ধ চিন্তার আঘাতে অরিন্দম ক্ষত বিক্ষত হয়।

এই সময়ে একদিন সুরঙ্গমার একখানা চিঠি পায়। অরিন্দমকে না দেখে সে আর থাকতে পারছে না, শুধু একবার তাকে দেখতে চায়।

অরিন্দম বিচলিত হয়, সুরঙ্গমার ডাকে সাড়া দিতে তার সমস্ত চেতনা উন্মুখ হয়ে ওঠে তবু কে যেন তাকে পেছনে টেনে রাখে পথের দিকে পা বাড়াতে দেয় না, পাগলের মত সে ঘর আর বাব করতে থাকে।

অকস্মাৎ অরিন্দমের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে যায়, সুরঙ্গমার ওপর প্রবল বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন ভরে ওঠে। তাব সকল দুঃখের মূল এই মেয়েটি, সে কেন তার জটিল জীবনের সঙ্গে অরিন্দমকে এমন করে জড়ালো ? সরল বিশ্বাসে ফুলের মালা ভেবে যাকে সে গলায় তুলে নিয়েছিল আজ সে গলার ফাঁস হয়ে অরিন্দমের নিশ্বাস রোধ করে আনছে। এমন হবে তা তো সে কল্পনায়ও ভাবেনি।

পথের দিকে চেয়ে ছিল সুরঙ্গমা, কয়েকদিন পরে অরিন্দমেব একখানা চিঠি পেল। লিখেছে—"জীবনের রঙ্গীন দিনগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। দুঃখ পাচ্ছি, তবু তোমার সঙ্গে আর দেখা করার আমার প্রবৃত্তি নেই। এ দেশ আর আমাকে বিন্দুমাত্র টানছে না, শীগগিরই এখান থেকে দেশে চলে যাচ্ছি।"

দেখা করার প্রবৃত্তি নেই কেন ? সুরঙ্গমার মাথার মধ্যে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে, তবে কি অরিন্দম অবিশ্বাস করে তাকে, ঘৃণায় তার দিক থেকে তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ? অকপটে নিজের জীবনের কথা জানিয়েছিল তাই শুভেন্দুর মত সেও তাকে তবে দুশ্চরিত্রা ভেবেছে ? সত্যকে ধারণা করা কি এতই কঠিন, সব পুরুষের মনই কি এক ছাঁচে ঢালা ?

উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো শক্ত হয়ে ওঠে সুরঙ্গমার। মুখোমুখি একবার অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করবে ও, কেন ওর সঙ্গে দেখা করবার তার প্রবৃত্তি নেই? অরিন্দম কি তবে ওকে ঘৃণা করে?

পাগলের মতো জেনেভায় চলে যায় সুরঙ্গমা। তাকে দেখে জিন্ আর কৃষ্ণরাও দুজনেই আশ্চর্য হয়। এখন তো সুমির আসবার কোন কথা ছিল না তবে কি তার শরীর ভাল নেই, তাই সে এখানে চলে এসেছে, নাকি মনের অসুখ? অরিন্দম কোথায় গেল তারও তো আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, তবে কি সুমির সঙ্গে ওর মনো-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে? জিনের মন সন্দেহে পীড়িত হয় কিন্তু খোলা-খুলি সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, পাছে সে দুঃখ পায়।

কৃষ্ণরাও অফিসে অরিন্দমের খোঁজ করে তার একজন সহকর্মীর মুখে শুনতে পায় দুদিন আগে সে দেশে রওনা হয়ে গেছে। জিন্ আর কৃষ্ণরাও ভয়ানক বিস্মিত হয় কিন্তু সুরঙ্গমাকে জানাতে সাহস পায় না, জানে একথা শুনলে ও ভয়ঙ্কর আঘাত পাবে।

জিন্ আর কৃষ্ণরাওয়ের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল। সুরঙ্গমাকে একলা রেখে যেতে জিনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না, পার্টিতে গেলে ফিরতে রাত হয়ে যায়। জিন্ কৃষ্ণরাওকে বললো—তুমি একাই যাও, আমি আর যাব না, সুমি তাহলে একা থাকবে।

সুরঙ্গমা তাতে ভয়ানক আপত্তি করলো, জিন্‌কে কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে দিল না। জিন্ বললো—তাহলে ভাই সুমি, তুমি খেয়ে দেয়ে লক্ষ্মীটির মত ঘুমিয়ে পড়বে, কেমন? সুরঙ্গমা ওর মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে একটু হাসলো। সে হাসিটা জিনের কাছে কেমন একটু অস্বাভাবিক মনে হল। ওর কাঁধে হাত রেখে সে জিজ্ঞাসা করলো—সুমি, তোমার কি অসুখ করেছে?

সুরঙ্গমা সহজভাবে বললো—না।

কতকটা সন্দিগ্ধভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে জিন্ আত্মগতভাবে বলে—তবে তোমার হয়তো মন ভাল নেই। কী যে হবে!

এরপর জিন্ দুহাতে সুরঙ্গমার মুখখানা তুলে ধরে বললো—তুমি তা হলে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমরা যত শীগগির হয় ফিরে আসছি। সামাজিক ব্যাপার, পাঁচজন এক জায়গায় হবে, নাচ গান সবই আছে, জড়িয়ে পড়তে হয়। তবু আমরা যত শীগগির পারি ফিরে আসতেই চেষ্টা করব।

চিন্তিত মনে জিন্ কৃষ্ণরাওয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

খাবার জন্যে জিন্ বারে বারে অনুরোধ করে গেছে, সে কি কিছু খাবে? খাবারের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এল সুরঙ্গমা, খেতে একটুও রুচি নেই। রুচি নেই জীবনে, আরও ভয়াবহ জিনিস নিজের মধ্যে অনুভব করলো সুরঙ্গমা। অরিন্দমের ভালবাসায় আর তার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। অরিন্দম তার কে? শুধু পথের পরিচয়।

মাথার মধ্যেটাতে কেমন অবসাদ বোধ করে সুরঙ্গমা। কি রকম যেন চিন্তাধারা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কোন শৃঙ্খলা নেই। অবসন্ন শরীরে সোফার উপরে ধপ্ করে বসে পড়ে সে। কিন্তু তাকে যে অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সে না আসুক সুরঙ্গমার যেতে হবে তার কাছে, কোথায় তাকে পাবে ও? যেখানে হোক পেতে হবে তাকে, তার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে জিজ্ঞাসা করবে কেন সুরঙ্গমার সঙ্গে দেখা করতে তার প্রবৃত্তি নেই? সে কি সুরঙ্গমাকে চরিত্রহীনা ভেবেছে—তাই তাকে ঘৃণা করে? কঠিন প্রত্যাখ্যানে তার ভালবাসাকে অস্বীকার করে বলবে, তোমার সঙ্গে তো সুরঙ্গমার পথের পরিচয়, পথের পরিচয়ে অপমান করবার অধিকার জন্মায় না। যেমন একদিন শুভেন্দু সেনের স্ত্রী সুরঙ্গমা সেন বিবাহসম্বন্ধ অস্বীকার করে সুরঙ্গমা মিত্র হয়ে পিতৃপরিচয়ে ফিরে গিয়েছিল তেমনি করে অরিন্দমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলবে, তোমার সঙ্গে তো আমার কোনদিন আত্মিক সম্পর্ক ছিল না, কে তুমি, তোমাকে তো আমি চিনি না।

অকপট হয়ে সত্যকে প্রকাশ করেছিল সে, তার বিনিময়ে পেয়েছে প্রত্যাখ্যান, পেয়েছে অপমানের লাঞ্ছনা। না, সত্যনিষ্ঠার কোন মর্যাদা জগতে নেই, সততা বলে কিছু নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, মনুষ্যত্ব নেই। সংস্কৃতি মিথ্যে, সুরুচি মিথ্যে, সতীত্ব একটা মিথ্যের ছলনা। এতদিন ধরে যা তাকে বেঁধে রেখেছিল সেই সংস্কারের শিকল আজ ছিঁড়ে ফেলবে সে, যাবে সেই ইতালীয়ান ছেলেদের কাছে যারা তার দেহকে কামনা করেছিল। রাত্রির অন্ধকারে শিক্ষার সংযমের সব বাধাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তাদের কাছে আজ আত্ম-সমর্পণ করবে সুরঙ্গমা, দেহ তার দেবতার মন্দির নয়, পিশাচের লীলাক্ষেত্র হোক। উঃ মাথার মধ্যে আগুনের দাহ, অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্ষিপ্তের মত সোফা থেকে লাফিয়ে উঠলো সুরঙ্গমা, দুহাতে নিজের চুল মুঠো করে ধরলো। তারপর হা হা করে হেসে উঠে পরমুহূর্তেই হাতের মুঠি খুলে নেয়, আতঙ্কিত চোখে চারদিকে তাকায়। এমন করছে কেন সে! পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? না না, পাগল হলে চলবে না, পুরুষের অশ্রদ্ধা পাগল করেছে তাকে। পুরুষই দেবে তাকে নতুন জীবন, সেই যারা পঁ হ্যু মঁব্রঁা ব্রিজের ওপর থেকে ডেকেছিল তাদেরই সঙ্গিনী হয়ে অন্ধকার নরকে ডুবে যাবে সে। প্রতিশোধ নেবে, যারা তাকে অস্পৃশ্য ভেবে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে দূরে সরে গেছে এমনি করে সেও তাদের শুচিতার দম্ভকে ঘৃণার কশাঘাত করবে।

উগ্রভাবে প্রসাধন করলো সুরঙ্গমা। ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক্ ঘন করে লাগালো, গালে রুজ মাখলো, জরির চুমকী বসানো গাঢ় নীল শাড়ী পরলো। শাড়ী ব্লাউজের পরবার ভঙ্গিতে শালীনতার লেশমাত্র রইলো না, দেহের যৌবন উদগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। ওভার কোটটা টেনে নিয়ে টলতে টলতে সে বেরিয়ে গেল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

আলোয় উজ্জ্বল পঁ দ্যু মঁব্লাঁ। ব্রিজে তখনও পথচারী আর যানবাহনের চলাচলের বিরতি হয়নি। ব্রিজের রেলিঙের ওপর শরীরের ভার রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সুরঙ্গমা একদৃষ্টে লেকের দিকে চেয়ে আছে, চোখে তার পলক পড়ছে না। হাজার প্রদীপের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত সুন্দরী লাক লেমাঁ (Lac Leman) যেন তারাখচিত গাঢ় নীল শাড়ী পরে রূপে ঝলমল করছে, ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় হীরক-চূর্ণ ছড়িয়ে পড়ছে। ওই রূপসী লেক, কত মানুষের প্রেম তাকে দৃষ্টির আশ্লেষ দিয়ে আলিঙ্গিত করছে, ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছল ছল প্রাণে দুলে দুলে আনন্দ বিলিয়ে দিতে দিতে সে চলেছে। সুরঙ্গমার জীবনে তো মানুষকে দেবার আর কিছু নেই, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, তার জীবনের সব আনন্দ মরুভূমির দিগন্তবিস্তারী হিংস্র পিপাসা নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছে। সুতীব্র জিঘাংসা, সুকঠিন তার আঘাত!

রাত বেশী হয়ে আসে, পথ জনবিরল হয়ে আসছে, সুরঙ্গমা ঠিক তেমনি ভাবে লেকের দিকে চেয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুই একজন পথচারী এই ভারতীয় মেয়েটির দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকায়, তার বেশভূষার দিকে চেয়ে আত্মগতভাবে অস্ফুট মন্তব্য করে, তারপর নিজের গন্তব্যস্থলে চলে যায়। তারা দাঁড়ায় না, মেয়েটিকে কোন প্রশ্ন করতেও চেষ্টা করে না। রাত ক্রমে গভীর হয়, পথ নির্জন হয়।

অসহিষ্ণু অধীর হয়ে ওঠে সুরঙ্গমা। কই তারা তো এখনও এল না—যারা তাকে ভোগপণ্যা করে নিয়ে কলঙ্কের কালিতে ঢেকে দেবে তার নাম, নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেবে তার পরিচয়। দেহের পসরা সাজিয়ে নিয়ে যাদের জন্যে সে প্রতীক্ষা করে আছে এই চরম

মুহূর্তে তাকে অন্ধকারের অতলে টেনে নিয়ে যাবে যারা কোথায় তারা, তারা কোথায় ?

সুরঙ্গমার সন্ধানী দুই চোখ আগুনের মত জ্বলতে থাকে, সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

যাদের সে নরকের কীটের চেয়েও বেশী ঘৃণা করে হয়তো আরও রাত হলে তারা আসবে, তাদের কাছে শরীরকে সমর্পণ করে আজ যে সত্যিকার চরিত্রহীনা হতে হবে তাকে। চরিত্রবান পুরুষের অহঙ্কারকে দুপায়ে মাড়িয়ে লম্পটের সম্ভোগের সঙ্গিনী হয়ে চরিত্র-বানকে চরম বিদ্রূপে তীব্র উপহাসের অট্টহাসিতে আজ লাঞ্ছিত করবে সে। সুরঙ্গমা হা হা করে হেসে ওঠে, তীক্ষ্ণ তার আওয়াজ দূরে প্রতিধ্বনিত হয়।

উঃ কী গাঢ় অন্ধকার, কোথায়ও এক ফোঁটা আলো নেই, এত আলো কোথায় মিলিয়ে গেল! সুরঙ্গমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যে, উঃ কি নিবিড় কি কালো, কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার!

জিন্ আর কৃষ্ণরাওয়ের বাড়ী ফিরে আসতে সেদিন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে ফিরে সুরঙ্গমাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তারা আতঙ্কে অস্থির হল। তখনই ফোন করে পুলিসকে সে কথা জানিয়ে সাহায্য চাইলে জেনেভা পুলিস কাল বিলম্ব না করে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। সন্ধানে জানা গেল—কৃষ্ণরাওয়ের বর্ণনা মত একটি মেয়েকে একজন পুলিস গভীর রাত্রে ব্রিজ থেকে লেকের জলে পড়ে যেতে দেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে জল থেকে উদ্ধার করে এমার্জেন্সী হাসপাতালে পোঁছে দেওয়া হয়। কৃষ্ণরাওকে টেলিফোনে সেই সংবাদ জানিয়ে পুলিস বিভাগ মেয়েটিকে সনাক্ত করবার জন্যে তাকে হাসপাতালে যেতে অনুরোধ করলো। সাংবাদিকগণ অনেক ক্ষেত্রে পুলিসের কাছ থেকে নানা ঘটনার

সংবাদ সংগ্রহ করেন। সুরঙ্গমার ক্ষেত্রেও তাঁরা এইরকম পুলিসী সূত্রেই সংবাদ পেয়েছিলেন—একটি সুন্দরী ভারতীয় তরুণী লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। হাসপাতালে পাঠাবার সময় পুলিসের কাছে মেয়েটিকে মৃতই অনুমিত হয়েছিল।

পরদিনের সংবাদ পত্রে এই শোচনীয় খবর প্রকাশিত হল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিকগণও অবিলম্বে খবরটা ভারতবর্ষের কাগজে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার কাগজে সংক্ষিপ্ত ভাবে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তাতে মেয়েটির নাম এবং সামান্য পরিচয়ও ছিল।

আকস্মিক এই সংবাদে সঞ্জয় বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে যায়, সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তার মন দারুণ সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়। বিহ্বল হতচেতনের মত সে কাগজের দিকে চেয়ে থাকে। এই ভয়ঙ্কর শব্দ কয়েকটির অর্থ যেন সে কিছুতেই অনুধাবন করে উঠতে পারে না। এও কি সম্ভব? সুরঙ্গমা এ পৃথিবীতে নেই, সে আত্মহত্যা করেছে! সুরঙ্গমার মত মেয়ে, শিক্ষায় দীক্ষায় রুচির পরিচ্ছন্নতায় নির্মল, ফুলের মত কোমল যার মন সেই মেয়ে কেমন করে এমন ভয়ানক কাজ করলো।

পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকে সঞ্জয়, অনেকক্ষণ পরে তার দুই চোখে অশ্রু দেখা দেয়। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে মনে মনে বলে—এই-ই তো স্বাভাবিক, সে ভুল ভেবেছিল। নির্মম জগতের স্বার্থপরতার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে সুরঙ্গমার মত মেয়েরাই তো পৃথিবীতে আসে।

॥ ছত্রিশ ॥

সুরঙ্গমাকে জল থেকে তুলে আনার পর তাকে অপিতাল কঁতোনাল (Hopital Cantonal)-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ও দেশের বিশিষ্ট শরীর বিজ্ঞানীরা তার দেহ পরীক্ষা করেন। কৃত্রিম শ্বাস-

প্রশ্বাস সঞ্চালনের জন্যে চেষ্টার পরেও যখন হৃৎস্পন্দনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন মেয়েটি জীবিত কিনা সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ সংশয়াপন্ন হলেন। চরম সিদ্ধান্তে আসার আগে সম্পূর্ণভাবে নিঃসংশয় হবার জন্যে নতুন উদ্যমে আবার তাঁরা পরীক্ষায় ব্রতী হলেন। দেহের কোন যন্ত্রই বিকৃত হয়নি, মনে হয় হঠাৎ হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে মাত্র, তাকে চালু করতে পারলেই আবার প্রাণ প্রবাহ সক্রিয় হয়ে উঠবে এইরকম একটা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। সে এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা, কোন আকস্মিকের আশা নিয়ে ভারতবর্ষের এক অপরিচিতা মেয়েকে জীবন দানের জন্যে পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান তার সমগ্র শক্তি নিয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাঁদের নিঃশব্দ দ্রুততা এবং কর্মব্যস্ততা যেন যান্ত্রিক ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। মৃতকল্প নারীর মুখের ওপর কয়েক জোড়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে, তার মুখের কোন রেখার অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনও যাতে তাঁদের দৃষ্টিকে অতিক্রম না করতে পারে। ঘন ঘন তাঁরা হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করছেন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে পাছে তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যু তার অপ্রতিরোধ্য অধিকারকে সন্দেহাতীত নিশ্চয়তায় পরিণত করে।

এমনি কঠিন সংগ্রামের পরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর সৃষ্টি করে অসাড় নারীর হৃৎস্পন্দনের অতি ক্ষীণ আভাস বিজ্ঞানীদের যন্ত্রে ধরা দিল। তাঁদের গম্ভীর কঠিন মুখের ওপর আশার আলো কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ নেই যতক্ষণ না পরীক্ষার ফল স্থায়িত্বে দৃঢ় হয়। অতি ক্ষীণ স্পন্দন কখনো স্তিমিত কখনো স্বাভাবিক, এইভাবে অতন্দ্র উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পরে যখন সুরঙ্গমার হার্টের কাজ সুনিয়মে চলতে লাগলো তখন সফলকাম চিকিৎসকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

সংবাদপত্র জগতে হৈ চৈ পড়ে গেল—চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মৃত্যুকে

জয় করেছেন। তাঁদের নতুন পরীক্ষার থিওরী সম্বন্ধে জানবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আবেদন আসতে লাগলো।

ভারতের সংবাদপত্রেও এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ পরিবেশিত হল। বিদেশে ভারতীয় মেয়ের আত্মহত্যার খবর জনসাধারণের মনকে অন্তরালের রহস্যগূঢ় বেদনায় ব্যথিত করেছিল, সাংবাদিকগণ তাঁদের সে ব্যথা নিরসন করলেন এবং প্রকৃত তথ্যসংগ্রহে নিষ্ঠার অভাবে যে মেয়েটির ভুল মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হল। দুর্ঘটনার সংবাদ পাবার পরই সঞ্জয় ট্রাঙ্ক কল্ করে কৃষ্ণরাওকে ডাকে, বলে—খবরের কাগজের মারফত সুরঙ্গমার মৃত্যু-সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছেছে, সে সব কিছু জানতে চায়। বেশী কথা সঞ্জয় বলতে পারেনি তার গলা ভেঙ্গে এসেছে।

ব্যগ্র কণ্ঠে কৃষ্ণরাও প্রথমেই তাড়াতাড়ি বলে—সঞ্জয়, সুরঙ্গমাকে আমরা হারাইনি, তাকে ফিরে পেয়েছি, তুমি আশ্বস্ত হও। তোমাকে এ কথা জানাতে পারছি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ। জীবনে কখনও ভগবানকে স্মরণ করেছি কিনা মনে পড়ে না কিন্তু আজ করছি। চিকিৎসকরা এখনও সুরঙ্গমাকে দেখার অনুমতি দিচ্ছেন না তবে সংবাদ নিয়ে জেনেছি তার জীবন সম্বন্ধে এখন আর কোন সংশয় বা উৎকণ্ঠার কারণ নেই। তুমি শান্ত হও সঞ্জয়, চিঠিতে তোমাকে সব কথাই জানাচ্ছি।

সেই ডাকেই সঞ্জয় কৃষ্ণরাওয়ের চিঠি পেল। অরিন্দম ও সুরঙ্গমা সম্বন্ধে সে যতখানি জানতো সব কিছুই বিস্তারিত লিখে জানিয়েছে। অরিন্দমের সঙ্গে সুরঙ্গমার জেনেভাতে পরিচয়, তারপর দুজনের ভালবাসা, দীর্ঘ দিন একসঙ্গে মেলামেশা, একসঙ্গে বেড়ানো, সুরঙ্গমার আকর্ষণে অরিন্দমের বারে বারে লণ্ডনে ছুটে যাওয়া, সব জানিয়ে তারপর লিখেছে—এত ঘনিষ্ঠতার পরেও অরিন্দম কেন যে হঠাৎ কারুকে না জানিয়ে দেশে চলে গেল আর সুরঙ্গমা নিজের জীবন নষ্ট করবার উন্মত্ততায় এই কাজ করে বসলো সে সম্বন্ধে জিন্ আর

আমি কোনই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি, কারণ স্বরঙ্গমার লেখা এমন কোন কাগজপত্র বা চিঠি পাওয়া যায়নি যাতে এ সম্বন্ধে কোন কিছু অনুমান করা চলে।

জেনেভা পুলিস লণ্ডন পুলিসের সাহায্যে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছে, তাদের ধারণা ভালবাসার ক্ষেত্রে আঘাত পেয়েই মেয়েটি জীবন নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল।

সবশেষে কৃষ্ণরাও লিখেছে—সঞ্জয়, তুমি জানো স্বরঙ্গমা আমার নিজের বোনের চেয়েও বেশী, আমরা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, তাকে ফিরে পেয়ে স্বর্গ হাতে পেয়েছি। যদি সম্ভব হয় তুমি একবার এসো, তোমাকে দেখলে ওর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এটা খুবই আশা করছি।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

স্বরঙ্গমা জীবিত আছে এই নিশ্চিত তথ্য সংবাদপত্রে জানার পরে সেইদিনই অমিতা সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করলো। সঞ্জয় জেনেভাতে যাবার উদ্যোগে ব্যস্ত, অমিতা বললো—সঞ্জয়দা, তুমি নয়, এখন ওখানে শুভেন্দুদাকে যেতে হবে। এখন তাকেই প্রয়োজন, যে গ্রন্থি ওরা পাকিয়েছে, তা ওদের হাত দিয়েই খুলবে, তোমার হাতে নয়।

সঞ্জয় অবাক হয়ে অমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, ওর বক্তব্যের যুক্তি মনে মনে স্বীকার করে নিল, তবু বললো—কিন্তু ওরা যে দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাতো তুমি জানো অমিতা, ওদের দুজনের দেখা হওয়াটা স্বরঙ্গমার পক্ষে শুভ হবে কিনা তা বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া, শুভেন্দু যেতে রাজী হবে কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে!

অমিতা আবেগের সঙ্গে বললো—তুমি জানো না সঞ্জয়দা, স্বরঙ্গমাকে হারিয়ে শুভেন্দুদা জীবন্মৃত হয়ে আছে। কি ভয়ানক

অন্তর্দাহে হাসপাতাল খুলে জনসেবার মধ্যে সে মনের সান্ত্বনা হাতড়ে বেড়াচ্ছে তা আমি জানি, জীবনের সব কথা সে আমাকে খুলে বলেছে। মনের মধ্যে সুরঙ্গমার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে সে রাতদিন ঘুরে মরছে। আমি আজই রাত্রের প্লেনে লক্ষ্মৌ যাচ্ছি, শুভেন্দুদাকে যদি সুরঙ্গমা ক্ষমা করে থাকে তবে শুভেন্দুদাই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তোমাকে অনুনয় করি সঞ্জয়দা, তুমি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ কোরো না। সঞ্জয় স্তব্ধ হয়ে রইলো, খানিকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তবে তাই হোক্।

একটু থেমে অমিতা আবার বললো—সুরঙ্গমাকে আমি চিনি সঞ্জয়দা, বড় নরম ওর মন, শুভেন্দুদার এ বিরাট ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ না করে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না, সেও যে বড় দুঃখ পাচ্ছে। জানি ও বড় অভিমানিনী তবু শুভেন্দুদাকে পেলে সব অভিমান ভুলে যাবে, নিশ্চয়ই সে ফিরে আসবে সঞ্জয়দা।

অমিতাকে দেখে শুভেন্দু মোটেই অবাক হল না, সে মনে মনে জানতো যে অমিতা তার কাছে আসবে। অমিতা ওর সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, আকুল হয়ে বললো—তুমি যাও, যাও শুভেন্দুদা, একটুও দেরি কোরো না। তোমার অবহেলায় যে জীবন বিসর্জন দিতে বসেছিল, যার জন্যে তোমার সমস্ত মন ব্যথায় জর্জরিত হয়ে আছে, তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে এসো।

শুভেন্দু অমিতার হাত ধরে তুললো। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর সঞ্জয়ের মত সেও সংশয় প্রকাশ করে বললো—সুরঙ্গমার এখনকার শারীরিক অবস্থায় আমার সঙ্গে দেখা হওয়া কি ভাল হবে? সে আমাকে ক্ষমা করেছে কিনা তাতো আমি জানতে পারিনি, আমি যে তার মন ভেঙ্গে দিয়েছি অমিতা।

আর্তকণ্ঠে অমিতা চেঁচিয়ে উঠলো—না, না, তুমি বুঝতে পারছো

না শুভেন্দুদা, বুক তার ফেটে যাচ্ছে তোমার ভালবাসার তৃষ্ণায়। কত বড় ব্যথা বুকে নিয়ে সে জীবন শেষ করতে গিয়েছিল, তা তুমি না বোঝো, মেয়ের মন নিয়ে আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তোমার পায়ে পড়ি শুভেন্দুদা সুরঙ্গমাকে বাঁচাও, তাকে গিয়ে নিয়ে এসো, আর এক বিন্দুও দ্বিধা কোরো না।

॥ আটত্রিশ ॥

জেনেভার বিখ্যাত ক্লিনিক বোলিয়্যতে (Clinique Beaulieu) অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের তত্বাবধানে সুরঙ্গমাকে রাখা হয়েছিল। তাকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে, তার মনকে সহজ অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁদের নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হচ্ছিল। যে জীবন মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে তাকে সুস্থ মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নার্সিং হোমের ডাক্তার ও সেবিকারা হাসিতে গল্পে সেবায় স্নেহে অক্লান্ত, এ যেন ব্রতনিষ্ঠা, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

প্রতিদিন সকালে ডক্টর মানহার্ট আসেন, শারীরিক কুশল প্রশ্ন করবার পর ডাক্তার তার মাথার ওপরে হাতের মৃদু ছোঁয়া দিয়ে বলেন—মাই ডারলিং গার্ল, শীগগির ভাল হয়ে ওঠো, তোমাকে নিয়ে আমরা বেড়াতে বার হবো, কি বলেন মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল্‌?

নার্স মিষ্টি হেসে বলেন—নিশ্চয় ডক্টর, আমাদের দেশের অনেক কিছু দেখতে যে মাদ্‌মোয়াজেল মিটারের বাকী রয়ে গেছে।

স্নিগ্ধ ও মৃদু হাসিতে সুরঙ্গমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এই অজানা পরিবেশের সহানুভূতি আর স্নেহের স্পর্শ তার মনকে আর্দ্র করে, চোখকে সজল করে তোলে।

ভিজিটার্স আওয়ার-এ কৃষ্ণরাও ও জিন্‌ এসেছিল, প্রথম দিকে ডাক্তাররা অবশ্য রোগিণীর সঙ্গে তাদের দেখা করার অনুমতি দেননি।

তাঁরা বলেছিলেন রোগিণীর মস্তিষ্কের অবস্থা এখনও যথেষ্ট স্বাভাবিক নয়, পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে তার পূর্ব স্মৃতি জেগে উঠতে পারে, তাতে গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এখন কোন উত্তেজনার সুযোগ দেওয়াকে তাঁরা অনুমোদন করতে পারেন না।

সুরঙ্গমার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য ডাক্তার তাদের অবহিত করেছিলেন, কৃষ্ণরাও আর জিন্ তাতেই খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

সুরঙ্গমা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হবার পরে ওরা দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিল, তবে ডাক্তাররা প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছিলেন যে, রোগিণীর কাছে কোন পূর্ব প্রসঙ্গ যেন কেউ না তোলেন অথবা বেশী কথা বলার অবসর তাকে না দেন।

সঞ্জয় কৃষ্ণরাওকে শুভেন্দুর ওদেশে যাবার বিষয় জানিয়েছিল। এয়ার পোর্টে কৃষ্ণরাও শুভেন্দুর সঙ্গে পরিচিত হল। শুভেন্দু তার কাছে ক্লিনিক বোলিয়্যর ঠিকানা পেল।

শুভেন্দু ক্লিনিকে যখন ডক্টর মানহার্ট এর সঙ্গে দেখা করলো এবং জানালো যে সে ভারতবর্ষ থেকে আসছে তিনি জানতে চাইলেন ম্যঁসিয়ে সেন মাদ্‌মোয়াজেল মিটারের কে হন, তাঁর নামের কার্ড দেখে অনুমান হয় তিনি ওর ভাই নন্।

ডাক্তার অবশ্য মেয়েটির সম্বন্ধে তার পরিচিত কারুকে কোন প্রশ্ন করেননি, কারণ তাতে তাঁর প্রয়োজন ছিল না। তিনি ধারণা করেছিলেন মেয়েটি কুমারী জীবনেই পড়াশোনা করতে এসেছিল; এ ধারণার কারণ—কুমারী শব্দটাকেই তিনি ওর নামের আগে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। তিনি কৃষ্ণরাওয়ের মুখে শুনেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ওর ভাইযের জেনেভাতে আসার সম্ভাবনা আছে।

ডক্টর মানহার্ট-এর প্রশ্নে শুভেন্দু দুই এক মিনিট মাথা নীচু করে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো—আমাদের এক সময় বিবাহ হয়েছিল, তার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

শুনে বিচক্ষণ ডাক্তার অল্পক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলেন, মনে হয় তিনি যেন কুমারী মিত্রের সম্বন্ধে খানিকটে আলোয় এলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—এর জন্য কি মেয়েটির মনে তীব্র বেদনা ছিল?

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে শুভেন্দু উত্তর দিল—হয়তো ছিল, আমি ঠিক জানি না, কারণ বিচ্ছেদ হবার পরই ও বিদেশে চলে আসে। কিন্তু এটা স্থিরই জানি যে, ও আমাকে ভয়ানক ভালবেসেছিল, ওর দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, তবু—শুভেন্দু থেমে গেল।

ডক্‌টর কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। নিজের মনেই তিনি আলোচনা করলেন, মেয়েটি তার স্বামীকে গভীর ভাবে ভালবেসেছিল কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। মনের ওপর এই প্রচণ্ড চাপই হয়তো তাকে জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্ত করে তোলে এবং এক দুর্বল মুহূর্তে অসুখী জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তার কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল।

ডক্‌টর মানহার্ট গম্ভীর ভাবে বললেন—ম্যঁসিয়ে, আপনাকে আজ আমি ফিরে যেতে অনুরোধ করছি। রোগিণীর সঙ্গে আপনার দেখা হতে দেওয়াটা আমাদের পক্ষে উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে, সাময়িক উত্তেজনায় মানসিক বিকৃতির ফলে ওঁর জীবন নাশ করবার প্রবৃত্তি এসেছিল। তাই ওঁকে কোন রকম উত্তেজনার সুযোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

শুভেন্দু মুখ নীচু করে ছিল এবার মুখ তুলে বললো—অল্পক্ষণের জন্যেও কি দেখা হওয়া সম্ভব নয়?

ডক্‌টর মানহার্ট তার কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন—না। আপনি জানেন না, কি কঠিন চেষ্টায় আমরা ওঁকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, এখনও

তিন সপ্তাহ পূর্ণ হয়নি। এখন ওঁকে যাতে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারি সে দায়িত্ব আমাদের। আপনি কিছু মনে করবেন না মঁ্যসিয়ে সেন।

শুভেন্দু দু এক মিনিট নিঃশব্দে রইলো তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো—আপনাদের কঠিন কর্তব্যের সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে, আমিও ডাক্তার। রোগিণীর ভালমন্দের বিবেচনা করবার অধিকার আপনাদের নিশ্চয়ই আছে, ওর জীবন এখন আপনাদেরই। আমি ফিরে যাচ্ছি যদি সময় ও সুযোগ মত তাকে একবার আমাব কথা জানানো উচিত মনে কবেন তবে জানাবেন।

শুভেন্দু উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে শুভেন্দুব হাতখানি ধবলেন, বললেন—মাপ করবেন মঁ্যসিয়ে সেন, আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছেন নিশ্চয়ই। একটি কথা আপনাকে বলে রাখি, আমবা আস্তে আস্তে কুমারী মিত্রের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করব। আপনার সম্বন্ধে তাঁর মন যদি অনুকূল অবস্থায় আছে বুঝতে পারি তবে আপনার এদেশে আসবার কথা তাঁকে জানাব, যদি তিনি ইচ্ছুক থাকেন তবেই আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হবার ব্যবস্থা হতে পারবে। আপনার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যান, যা হয় আপনাকে জানাব। গুড্‌বাই ডক্‌টর সেন।

শুভেন্দু আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ডক্‌টর মানহার্ট তার সেই নিস্তেজ পদক্ষেপ লক্ষ্য করলেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। বিবাহ বিচ্ছেদের অন্তরালে কত যে নিগূঢ় মনোবেদনা সমাজের বুকে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, কত আনন্দের সংসার কেমন করে ভেঙ্গে যায়, সন্তান-সন্ততির জীবনে কত বড় আঘাত নেমে আসে সে সব কথা স্মরণ করলেন। প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে অকৃতদার কিন্তু তিনি অনেক দেখেছেন, সহৃদয়তা দিয়ে অনেকের ব্যথা অনুভব করেছেন।

মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল সুরঙ্গমার সব সময়ের সঙ্গিনী, রাত্রেও

সে রোগিণীর ঘরেই থাকে। ডক্‌টর মানহার্ট তাকে ডেকে পরামর্শ করলেন এবং তাকে কিছু উপদেশ দিলেন।

মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল অনেক কথার পর এক সময় সুরঙ্গমাকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কথার সূত্রে বলেছিলেন, তার এই মুহূর্তে কাকে দেখতে সব চেয়ে বেশী ইচ্ছা হয়?

শুনে সুরঙ্গমা একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তার দুই চোখ ছল ছল করতে লাগলো, বললো—যাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া তো সম্ভব নয়, তিনি এখন অনেক দূরে, ভারতবর্ষে আছেন। অনেক দিন দেখিনি, অনে—ক দিন—! সুরঙ্গমা আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে বোধহয় অতীত স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেল।

মাদ্‌মোয়াজেল ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর হাতখানি তুলে নিয়ে পাল্‌স্‌ পরীক্ষা করলেন এবং পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি ঘরে থাকলে হয়তো মেয়েটি এমন কিছু বলার জন্যে ব্যস্ত হবে যা তার পক্ষে এক দুঃখজনক অধ্যায়, তাতে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে মনে করে তিনি সরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন।

দু-একদিন মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল আর কোন কথাই তুললেন না। একদিন সুরঙ্গমা নিজেই ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলো—আপনি সেদিন আমাকে কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

মাদ্‌মোয়াজেল স্মিতমুখে বললেন—মনে কর যাকে তুমি ভালবাসো, যাকে দেখবার জন্যে তোমার মন ব্যাকুল, সে যদি এসে তোমার সামনে দাঁড়ায় তবে তুমি কি করবে?

স্বপ্নচ্ছায়ায় যেন সুরঙ্গমার দুই চোখ ঢেকে এল, দুই হাত বুকের ওপর রেখে আত্মগতের মত সে বললো—তাও কি সম্ভব?

স্নেহপূর্ণ স্বরে মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল বললেন—ঈশ্বরের কৃপায় অসম্ভবও কখনও কখনও সম্ভব হয়, মাদ্‌মোয়াজেল মিটার।

সুরঙ্গমা উৎসুক চোখে সেবিকার মুখের দিকে চাইলো, তার

দুই চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মাথাটা তুলে হাতের ওপর ভর দিয়ে আগ্রহভরে সে প্রশ্ন করলো—আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন, কেউ কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ?

সোবিকা সুরঙ্গমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রেখেছিলেন, ব্যাকুল ভাবে তাকে উঠে বসতে দেখে তিনি উদ্‌বিগ্ন হলেন। কাছে এসে আস্তে আস্তে তার হাত ধরে তাকে শুইয়ে দিতে দিতে বললেন—তুমি জানো তুমি এখনও দুর্বল, সবে দু'চার দিন হল তোমাকে নিয়ে একটু একটু বাবান্দায় বেড়াবার অনুমতি আমি পেয়েছি। তুমি যদি ব্যস্ত হয়ে নিজেকে কষ্ট না দাও, শান্ত হয়ে শোনো তবেই আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো।

সুরঙ্গমা ধীরে ধীরে মাথাটা বালিশে রাখলো, শান্তভাবে বললো—আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না আমি ভালই আছি। অনুগ্রহ করে বলুন।

মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল শুভেন্দুর নামের কার্ডখানা সুরঙ্গমার হাতে দিলেন, সুরঙ্গমা সেখানা তাব চোখের সামনে তুলে ধরলো। দু-তিন মিনিট কার্ডখানা ধরেই রইলো, মনে হয় তার চোখ বুঝি ঐটুকু লেখা পড়ে শেষ করতে পারছে না, হাত ওর থর থর করে কাঁপছে। মাদ্‌মোয়াজেল ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টি বিহ্বল, মুখ বিবর্ণ, সমস্ত শরীর নিশ্চল, যে অভাবনীয় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ওর দুর্বল মস্তিষ্ক কিছুতেই তাকে যেন ধারণার আয়ত্তে আনতে পারছে না। ডাক্তার কাছেই ছিলেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করলেন। সুরঙ্গমার হাত থেকে কার্ডখানা নিয়ে ওর হাতখানা ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় রেখে দিলেন। মাথার চুলের ওপর হাত রেখে স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন—শান্ত হও, নিজেকে অসুস্থ কোরো না।

কয়েক মিনিট পরে আস্তে আস্তে সুরঙ্গমার মুখের রং স্বাভাবিক হয়ে এল, তারপর তার মুদিত দুই চোখের পক্ষ্ম জলে ভিজে উঠলো।

সুস্থ হবার জন্যে রোগিণীকে সময় দিয়ে ডাক্তার কয়েক মিনিট ওই রকম ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর সেবিকাকে সম্বোধন করে কি একটা উপদেশ দিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

সুরঙ্গমার মনকে শান্ত ও প্রস্তুত হবার জন্যে আরও দু-একদিন সময় দিয়ে তারপর ডক্‌টর মানহার্ট টেলিফোনে শুভেন্দুকে ডাকলেন।

মাদ্‌মোয়াজেল ল্যানিয়াল আগেই সুরঙ্গমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, শুভেন্দু এসে সুরঙ্গমার বিছানার পাশে চেয়ারে বসলো। শ্রীমতী ল্যানিয়াল বেডটা তুলে সুবঙ্গমাকে একটু হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

দুজনেই নীরব—এমন কোন ভাষা নেই যা তাদের এতদিনকার পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনাকে কথায় রূপ দিতে পারে। সুরঙ্গমা একবার করুণ দুই চোখ মেলে শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে পর মুহূর্তেই ব্যগ্র হাত দুখানা চোখ বুজে শুভেন্দুর দিকে বাড়িয়ে দিল, শুভেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে ওই শীর্ণ হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সন্তর্পণে বুকে চেপে ধরলো। সেই স্পর্শের মধ্যে দিয়ে সুরঙ্গমার শরীর মনের নিঃশেষ আত্মসমর্পণ শুভেন্দুর দেহের সকল স্নায়ুতন্ত্রীকে অবশ করে দিয়ে তার নিগূঢ় চেতনায় ব্যাপ্ত হয়ে গেল, নিঃশব্দে চোখ বুজে সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে শুভেন্দু সেই পরমকাঙ্ক্ষিত স্পর্শকে নিবিড় ভাবে অনুভব করতে লাগলো।

শ্রীমতী ল্যানিয়াল একবার সতর্ক দৃষ্টিতে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন তারপর তিনি আর সেখানে থাকা প্রয়োজন বোধ করলেন না, পাশের ঘরে যেখানে ডক্‌টর মানহার্ট অপেক্ষা করছিলেন সেই ঘরে চলে গেলেন।

●